শতাব্দীর অভিশাপ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ

ফাল্গুন, ১৩৫২

মূল্য দুই টাকা আট আনা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু—

অধ্যাপক শৈলবিহারী হালদারের সংসারটি বড় নয়, ছোটই। পত্নী সুরুচিপ্রভা, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। বড় ছেলে রামেন্দুর বয়স বছর কুড়ি, বি-এ পড়ে। আর কনকলতা গত বৎসর প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে, আই-এসসি পড়তে গেছে ক'লকাতায় বেথুন কলেজে। পশ্চিমের এই শহরটিতে মেয়েদের কলেজেপড়ার ব্যবস্থা নেই। কনক ক'লকাতায় হস্টেলে থাকে।

শৈলবিহারী এখানকার কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক। বয়স—চুয়াল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু মাথায় বিস্তীর্ণ টাকের জন্যে আরও বেশী লাগে। দোহারা শরীরে বাঁধুনি আছে। সহকর্মী-মহলে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে। কিন্তু ছাত্রদের পক্ষে সে পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করা সহজ নয়। তার চেয়ে ঢের বেশি স্পষ্ট তাঁর স্বাদেশিকতা। খদ্দর ছাড়া আর কিছু তিনি নিজেও ব্যবহার করেন না, পরিবারের কাকেও ব্যবহার করতে দেন না। সমস্ত বাড়িখানায় কোথাও বিলাসের উপকরণ চোখেও পড়বে না!

বাড়িখানা ছোট, কিন্তু সুন্দর। শহর থেকে মাইল খানেক দূরে মাঠের মধ্যে কলেজ। তারই ওদিকে একেবারে পাহাড়ের কোলে তিন খানি বাংলো ধরণের বাড়ি, পাশাপাশি। তিনখানিই একই রকমের। চারদিকে ক্রোটনের বেড়া। মাঝে অনেকখানি জায়গার মধ্যে ছবির মতো রমণীয় এক একখানি বাংলো: ইটের দেওয়াল, খাপরার ছাউনি। সুমুখে ফুলের বাগান। একপাশে টেনিসের লন, অন্যপাশে তরকারীর বাগান। পিছনে খানিকটা দূরে চাকরদের থাকবার ঘর।

তিনখানি বাড়িই এই প্যাটার্নের। মাঝের বাড়িটিতে থাকেন শৈল-বিহারী। এপাশে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক নরেশ বড়ুয়া। ওপাশে ইতিহাসের অধ্যাপক এলয়সিয়াস গোপেন্দ্র সরকার। বড়ুয়ামহাশয় বৌদ্ধ এবং মিঃ সরকার ক্রিশ্চান। ওঁরা তিন বন্ধুতে শহর থেকে দূরে নির্জনে, রামনাদ পাহাড়ের নীচে যেন একটি ধর্মসমন্বয়ের উপনিবেশ স্থাপন করেছেন।

শৈলবিহারীর এখানে প্রায় বিশ বছর চাকরী করা হ'ল। কিন্তু বাড়িটা হয়েছে বছর দশ আগে। অর্থাৎ তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর। দু'পাশের বাড়ি দু'টি তার অনেক আগের। শৈলবিহারী জায়গাটা সেই সময়ে একই সঙ্গে কিনলেও, ঐ সময়ে মায়ের প্রবল আপত্তিতে ওখানে বাড়ি তৈরী করতে সাহস করেন নি। মা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী। সেই নিষ্ঠা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত ছুৎমার্গে এসে পৌছেছিল। বস্তুতঃ ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিচার করতে করতে এক একদিন তাঁর আহার পর্যন্ত হ'ত না। একদিকে বৌদ্ধ, আর একদিকে ক্রিশ্চান নিয়ে তিনি কিছুতে বাস করতে রাজি হলেন না। শৈলবিহারী এ নিয়ে আর তর্ক করেন নি। তিনি ভালো ক'রেই জানতেন, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। তাই জায়গাটা ফেলে রেখেছিলেন। তারপর মায়ের মৃত্যুর কিছু পরে বাড়ি আরম্ভ করলেন।

হাত দেড়েক উঁচু দাওয়ার উপর বাড়ি। চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা জাফরী দিয়ে ঢাকা। তার উপর আলোকলতার গাছ। মধ্যেকার বড় হলঘরখানার দেওয়াল ঘেঁসে গোটা বিশেক আলমারি, বইতে ঠাসা। সোফায়, কুশনে, টিপয়ে সেখানি সুরুচিসম্মত বিলাতী কেতায় সাজানো। দেওয়ালের ছবিগুলিও বিলাতী। কিন্তু সাধারণ বড়লোকের বাড়িতে যেমন দেখা যায় তেমন নয়; সেগুলি পছন্দ করার মধ্যে শৈলবিহারীর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি কিন্তু এঘরে বড় একটা বসেন না। এর পাশে একটি ছোট ঘর আছে, সেইটিই তাঁর পড়বার এবং বসবার ঘর। সেটিকে সজ্জার দিক দিয়ে প্রায় নিরাভরণ বলা চলে। মেঝেয় একখানা কার্পেট পাতা। কয়েকটা তাকিয়া সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে। মাঝখানে একটা অনুচ্চ ডেস্ক। একপাশে একটি ছোট বুক-কেস। বড় হল-ঘর আর এই ঘরের মধ্যেকার দরজায় একটা বিচিত্রিত খদ্দরের পুরু পরদা।

বেলা তখন তিনটের বেশি নয়। সুরুচি দিবানিদ্রা থেকে সবে উঠে এই ঘরখানি গোছগাছ করছিলেন। এমন সময় বাইরে রিক্শার ঠুং ঠুং শব্দে বুঝলেন, শৈলবিহারী কলেজ থেকে ফিরলেন। রিক্শাতেই কলেজে যাওয়া আসা করেন। সুরুচি হাতের কাজ ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি দক্ষিণের বারান্দার দিকে চললেন। কলেজ থেকে ফেরার পর রৌদ্রের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত শৈলবিহারী এইখানেই বিশ্রাম করেন।

সুরুচিকে দেখে শৈলবিহারী বললেন, তাড়াতাড়ি কিছু খাবার ক'রে দিতে পার? আমাকে এখনি বেরুতে হবে।

—হঠাৎ?

—হ্যাঁ। সাড়ে চারটের মোটরে বাবা আসছেন, সঙ্গে কনক। টেলিগ্রাম এসেছে।

শৈলবিহারী পকেট থেকে একখানা চিঠি আর একখানা টেলিগ্রাম বার করে টিপয়ের উপর রাখলেন।

সুরুচি ইংরাজি জানেন না। সুতরাং টেলিগ্রাম সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। বললেন, চিঠি কার?

—বাবারই। যাত্রা করবার আগে নেপাল থেকে লিখেছিলেন। টেলিগ্রামখানা ক'লকাতা থেকে ক'রেছেন।

সুরুচি চিঠিখানা খুলে বার দুই নাড়া চাড়া ক'রে বললেন, বাবাকে আমি কখনও বাংলাতে চিঠি লিখতে দেখলাম না।

শৈলবিহারী হেসে বললেন, না। কেবল তোমাকে একবার লিখেছিলেন।

—হ্যাঁ। সে আমি পড়তেও পারি নি। তবু উত্তর যদি দিলাম তো তার আর উত্তর এল না।

বোধ হয় তোমার চিঠিও তিনি প'ড়তে পারেন নি।

সুরুচি রেগে বললেন, আহা! আমার লেখা বুঝি খুব খারাপ?

হেসে শৈলবিহারী বললেন, পড়তে পারেন নি তোমার লেখার দোষে নয়, তাঁর পড়ার দোষে। দীর্ঘকাল নেপালে থেকে বাংলা বোধ হয় ভুলেই গেছেন।

সুরুচি উঠে বললেন, দাঁড়াও। তোমার খাবারের কথাটা ব'লে দিয়ে আসি।

ফিরে এসে সুরুচি বললেন, বিয়ের সময় তাঁকে প্রথম দেখি। কিন্তু সে আমার মনেও ছিল না। আসলে তাঁকে একবারই দেখেছি, মায়ের মৃত্যুর সময়।

শৈলবিহারী হেসে বললেন, আমিও তোমার চেয়ে আর একবার মাত্র বেশি দেখেছি, ক'লকাতায় এম-এ পড়ার সময়। সকালে হস্টেলে বসে পড়ছি। একটা জমকালো উর্দীপরা লোক এসে একখানা চিঠি দিলে। বাবার চিঠি। কি একটা প্রয়োজনে নেপালের মহারাজকুমারের সঙ্গে ক'লকাতা এসেছেন দিন কয়েকের জন্য। নীচে নেমে দেখি প্রকাণ্ড বড় একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। বাবার সঙ্গে দেখা করে এলাম পাঁচ মিনিটের জন্য।

একটু থেমে আবার বললেন, সেবার ক'দিন ক'লকাতায় ছিলেন জানি না ; কিন্তু দেখা ঐ একবারই হয়।

শৈলবিহারী শেষ রাত্রির চাঁদের মত বিষণ্ণভাবে হাসলেন।

সুরুচি অন্য দিকে চেয়ে শৈলবিহারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় শুনছিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, তোমরা তাঁকে এত ভয় কর কেন জানি না। আমার তো বেশ ভালো লাগে।

কিন্তু এ বাড়িতে তাঁর সম্বন্ধে এর বেশি আলোচনা নিষেধ। নিষেধ মায়ের আমলের। শৈলবিহারী সংস্কারবশে চুপ করে রইলেন। ঠাকুর খাবার দিয়ে গেল। কিছু পরে তিনি মোটর-স্টেশনের দিকে রওনা হইলেন। ইতিমধ্যে নিকুঞ্জবিহারী ওরফে হালদার-সাহেব সম্বন্ধে কতক-গুলি কথা জানা প্রয়োজন।

এখন তাঁর বয়স সত্তর পার হয়েছে। কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তিনি এম-এ পাস করেই নেপালের মহারাজকুমারের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে নেপাল চলে যান।

বিবাহ তার বছর কয়েক পূর্বেই হয়েছিল। বাপ-মায়ের তিনিই একমাত্র সন্তান। সুতরাং অতদূরে চাকরী নেওয়ায় তাঁদের মত ছিল না। দেশে ওঁদের কিছু জমিদারী আছে। সামান্য হলেও তা নিতান্ত সামান্য নয়। তার উপর নির্ভর করে বাকি জীবনটা তিনি বাপমায়ের কাছে-কাছেই থাকেন, এই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। কিন্তু যুবক হালদার-সাহেব সে ইচ্ছার সম্মান রক্ষা করলেন না। এমন কি যাত্রার জন্য একটা শুভদিন দেখারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। নিতান্ত অদিনেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। চোখের জলে মায়ের বুক ভেসে গেল। দেবতার দোরে সন্তানের কুশল কামনায় মাথা ঠুকে ঠুকে মাথা ফুলে

উঠল। পুত্রের পৌছানো সংবাদের টেলিগ্রাম না আসা পর্যন্ত তিনি অন্নজল স্পর্শ করলেন না। তাঁর স্ত্রী তখন নিতান্তই বালিকা। সে কাঁদলও না, হাসলও না, বাড়ির এই অবস্থায় অবাক হ'য়ে গেল। মনে মনে অনুমান করলে, এখান থেকে মাইল বিশেক দূরবর্তী তার পিত্রালয় থেকেও নেপাল নামক স্থান দূরে। কেবল হালদারের বাবা পুত্রের এই অবাধ্যতায় গুম্ হয়ে কি যেন এদটা বেদনা নিঃশব্দে চাপবার চেষ্টা করলেন।

এর পরে কিছুকাল যাবৎ নিকুঞ্জবিহারী প্রতি বৎসর শীতের সময় নিয়মিতভাবে দেশে আসতেন। তিন মাস একাদিক্রমে থাকতেন। মাঝে মাঝে কলকাতায় বেড়াতেও যেতেন। তিনি নেপালে চাকরী নেওয়ার বছর দুয়েক পরে শৈলবিহারীর জন্ম হয়। নিকুঞ্জবিহারী তখন পুরাদস্তুর সাহেব। স্বল্পভাষী এবং কর্মব্যস্ত বাপের সঙ্গে নিকুঞ্জবিহারীর সাক্ষাৎ হ'ত কম, কথা হ'ত আরও কম। এই অতিমাত্রায় সাহেবিয়ানা তিনি কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন জানা না গেলেও, মা যে এটা ভালোভাবে গ্রহণ করেন নি, তা স্পষ্টভাবে জানা যেত। পুত্রের চাল-চলন দেখে অকারণে তাঁর মনে নানা অজানা আশঙ্কার উদয় হ'ত। বোধ হয় সেইজন্যেই বৌমাকে নেপাল নিয়ে যাবার জন্যে বারে বারে জেদ করতে লাগলেন। কিন্তু বৌমার নেপাল যাওয়ার আরও অনেক বিলম্ব হ'ল। শৈলবিহারী যখন বছর সাতেকের, তখন তিনি নেপালে গেলেন। একাই গেলেন। অর্থাৎ শৈলবিহারী রইলেন পিতামহ এবং পিতামহীর কাছে। কারণ, শৈলবিহারীকে চোখের আড়াল করা তখন তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে শৈলবিহারী কাছে না থাকলে বুড়ো-বুড়ি দু'জনেই চোখে অন্ধকার দেখতেন। সুতরাং শৈলবিহারীর আর নেপাল যাওয়া হ'ল না।

গেলেন একা তাঁর মা। কিন্তু মাত্র মাস ছয়েকের জন্যে। তারপর একদিন অকস্মাৎ টেলিগ্রাম করে ভাইকে আনিয়ে তাঁর সঙ্গে ফিরে এলেন শ্বশুরালয়ে। কেন তিনি এমন অকস্মাৎ চলে এলেন, কি হয়েছিল স্বামীর সঙ্গে, কোথায় পেলেন আঘাত, সে কথা একমাত্র শাশুড়ী ছাড়া আর কাউকে বলেন নি। এই সময় থেকেই নিকুঞ্জবিহারীর সঙ্গে দেশের এবং পরিবারবর্গের সকল সম্পর্ক লোপ পেল। শীতের সময় একবার যে বাড়ি আসতেন তাও বন্ধ হ'ল। এমন কি পত্র-ব্যবহারও।

প্রথম পত্র দিলেন শৈলবিহারীকে তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন পাসের খবর কাগজে দেখে। শৈলবিহারী সে পত্রেরও উত্তর দিয়েছিলেন গোপনে। তারপর থেকে মাঝে মাঝে পিতা-পুত্রে পত্র ব্যবহার হ'ত। পত্র-ব্যবহার বাড়ল শৈলবিহারীর মায়ের মৃত্যুর পর। কিন্তু তিনি রইলেন নেপালেই। ছেলের কাছে থাকতে কিছুতে সম্মত হলেন না। এবার হঠাৎ বিনা অনুরোধে কেন যে আসছেন, কত দিন থাকবেন, কিছুই এঁরা জানেন না।

হালদার সাহেব এই দশ বৎসরে যেন বিশেষ রকম বুড়ো হয়ে গেছেন। তিনি শৈলবিহারীর চেয়ে কয়েক ইঞ্চি লম্বা, রং তাঁর চেয়ে ফর্সা। কিন্তু এবারে ঈষৎ কুঁজো হয়ে পড়ায় আগের চেয়ে বেঁটে দেখাচ্ছে এবং বোধ হয় চর্মের লোলতার জন্যেই রঙও মলিন দেখাচ্ছে। অবিকল সেই রকম আছে কেবল তাঁর সপ্তম এডোয়ার্ডের প্যাটার্নের দাড়ি আর টাক, আর সেই শিশুসুলভ সরল ঠোঁটের অনাবিল হাসি।

শৈলবিহারী বললেন, বাবার শরীরটা বড় ভালো দেখাচ্ছে না। বিশেষ যত্ন করা দরকার।

সুরুচি বললেন, বোধ হয় সেইজন্যেই আমাদের কাছে এসেছেন। আর ছাড়া হবে না।

কনক কাছেই ছিল। বললে, হাঁ, সেইজন্যে বই কি! আমি চিঠি দিয়েছিলাম তাই।

সুরুচি বিস্মিতভাবে বললেন, তুই চিঠি দিয়েছিলি কি-রে! তুই তো কখনও তাঁকে চিঠি দিস নি?

কনক তরঙ্গভঙ্গে হেসে বললে, তুমি যে কি কথাই বল মা! কখনও চিঠি দিই নি ব'লে কোন দিন চিঠি দোব না?

সে কথায় কান না দিয়ে সুরুচি বললেন, তুই ওঁকে আসতে লিখেছিলি?

—না, ঠিক তা লিখি নি। লিখেছিলাম, বন্ধুদের সবাই কত দাদুর কথা বলে। শুধু আমিই আমার দাদুর কথা কিছুই জানি না। জ্ঞান হবার পর দেখিনি পর্যন্ত। পরের ডাকেই চিঠি পেলাম, উনি আসছেন।

সুরুচি বললেন, তা না হয় তাই হ'ল। কিন্তু আমিও এবার সহজে ছাড়ছি না। যাবার নাম করলেই এমন ঝগড়া করব।

কনকের যেন কথাটা ঠিক পছন্দ হ'ল না। ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, আহা, তাই বই কি! উনি যে কলকাতায় বাসা করবেন। নেপালে তো আর যাবেন না। আমি ওঁর কাছে কলকাতার বাসায় থেকে পড়ব।

—এ সব আবার কখন ঠিক হল? শৈলবিহারীর স্বরে বিস্ময়ের সঙ্গে ভয় মেশানো ছিল।

কনক মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বললে, হয়েছে। গাড়ীতে।

সে বেণী দুলিয়ে চ'লে গেল।

প্রথম গেল হল ঘরে। সেখানে দাদু নেই। দাদার পড়ার ঘরে গিয়ে দেখলে, দাদা একা পড়া করছে।

জিজ্ঞাসা করলে, দাদা, দাদুকে দেখেছ?

রামেন্দু পড়ার বই খুলে তাঁরই কথা ভাবছিল। বললে, বোধ হয় বাগানে ঘুরছেন।

কনক চলে যাচ্ছিল, কিন্তু রামেন্দু তাকে ডাকলে। রামেন্দুর কাছে কনকের মূল্য এই বোধ হয় প্রথম উপলব্ধ হ'ল। কারণ, দাদুর সঙ্গে তারই আলাপ হয়েছে আগে। রামেন্দুর সঙ্গে তাঁর সবেমাত্র পরিচয় হয়েছে। মাত্র কটি কুশল প্রশ্নের বিনিময়। এখনও সংকোচ কাটে নি। কনকের কাছ থেকে সে দাদুর সম্বন্ধে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে চায়। কিন্তু কনকের এখন মোটে ফুরসৎ নেই।

অস্থিরভাবে বললে, কি বলবে বল শীগগির ক'রে। আমার এখন অনেক কাজ। রাত্রে দাদু কি খাবেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

রামেন্দু হেসে বললে, তুই ব্যবস্থা করবি? তবেই হয়েছে!

হেসে ফেলে কনক বললে, বেশ, হয়েছে তো হয়েছে। তোমার কি বলবার কথা বলে ফেল দেখি!

ঠিক কি যে বলবার কথা তা রামেন্দুও নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না, কিন্তু আলোচনা আরম্ভ করবার জন্যে বললে, দাদু কি ভীষণ চুরুট খান দেখলি? আমার ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘর একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল!

রামেন্দু হা হা করে হাসলে।

কনকও হাসতে লাগল। বললে, অসম্ভব রকমের চুরুটখোর। পাইপটি সব সময় হয় মুখে, নয় হাতে। কাল ওটাকে লুকিয়ে রাখব, দেখি কি হয়।

রামেন্দু সভয়ে বললে, না না। ওসব ছেলেমানুষি করিস না। ফস্ করে রেগে চলে যেতে পারেন। শুনেছি নাকি ভীষণ বদরাগী।

দাদার অজ্ঞতায় কনক এবার সশব্দে হেসে উঠল। বললে, বদরাগী? মোটেই নয়। সমস্ত রাস্তা কি আমোদ করতে করতে যে এলেন!

বোনের উপর হিংসায় রামেন্দুর মুখ কালো হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, তোর সঙ্গে?

—না তো কি রাস্তার লোকের সঙ্গে?

কনক সগর্বে সুমুখের চেয়ারটা দোলাতে লাগল।

রামেন্দু বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু সমস্তক্ষণ সাহেবি পোষাকে থাকেন কেন? Ludicrous!

কনকও চটে গেল। বললে, তা ওঁর যদি ওই পোষাকেই আরাম হয়, তোমার আপত্তি করার কি আছে?

উত্তরে রামেন্দু শুধু বললে, আমার আপত্তির কি আছে? বাঃ!

কনক চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে গেল, কিছুই না জেনে তুমি দাদুর সম্বন্ধে যা খুশি তাই বোলো না।

বাগানেও কনক দাদুর দেখা পেল না। পেল টেনিস লনে। একখানা বেতের চেয়ারে বসে নিঃশব্দে পাইপ টানছেন। দূরে আমলকী বনের মাথায় চাঁদ উঠেছে। আর তারই আলো এসে পড়েছে ধূসর পাহাড়ের গায়ে। বোধ হয় তাই দেখছেন।

কনক এসে বললে, আপনি এখানে বসে আছেন, আর আমি আপনার জন্যে সৃষ্টি খুঁজে এলাম।

দাদুর মুখখানি শিশুর মতো সরল হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বললেন, সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়াকে কেন খুঁজতে গিয়েছিলে ভাই? কাঁঠাল গাছে কি কখনও আম পাওয়া যায়?

—আহা! আপনি বুঝি সৃষ্টিছাড়া? যাকগে, রাত্রে আপনি কি খান বলুন তো?

—বিশেষ কিছু না। শুধু একটুখানি দুধ আর সামান্য কিছু ফল।

—আর কিছু না?

—না।

—কনক চলে গেল। মাকে এই কথাটি বলে এসে দাদুর সামনে আর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

দাদু বললেন, ওইখানে বসলে?

—আর কোথায় বসব?

আকাশের দিকে চেয়ে হালদার সাহেব বললেন, তাই বস। আমাদের সময়ে কিন্তু অন্যরকম বসবার ব্যবস্থা ছিল।

—আপনাদের আমলের একটু নমুনা দিন।

—নমুনা দিতে পারি, কিন্তু বোধ হয় পছন্দ হবে না।

—দেখি যদি পছন্দ করতে পারি।

দাদু নির্বিকারভাবে বললেন, কথাটা বোধ হয় শুনেছ। আমি বলছিলাম, আধ-আঁচোরে বসবার কথা।

লজ্জায় মুখ নামিয়ে কনক বললে, যান।

কৃত্রিম দুঃখের ভঙ্গিতে দাদু বললেন, সেই ভয়েই তো বলতে চাই নি। একালে ওটি অচল, কি বল?

ধমক দিয়ে কনক বললে, আপনি থামবেন কি না বলুন তো?

নিরীহ বালকের মত দাদু চুপ ক'রে গেলেন। আকাশের দিকে চেয়ে পাইপ টানতে লাগলেন।

একটু পরে কনক হাসতে হাসতে বললে, জানেন দাদু, মা ভেবেছিলেন, আপনি এমনি এসেছেন।

—মা তো মিথ্যে ভাবেন নি দিদিভাই।

সমস্ত দেহে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কনক বললে, আহা! এমনি বই কি! এমনি আসবার লোক আপনি! আমি যদি টান না দিতাম আপনি কিছুতেই আসতেন না।

মাথা নেড়ে দাহু বললেন, তা সত্যি।

কনক চেয়ারটি দাহুর আরও কাছে টেনে নিয়ে এল। বললে, মা কি বলছিলেন, জানেন দাহু? বলছিলেন, এখান থেকে এক পা নড়বার নাম করলে এমন ঝগড়া করবেন আপনার সঙ্গে যে, থেকে যাবার পথ পাবেন না।

ভয় পেয়ে দাহু বললেন, ওরে বাবা! তা হ'লে সত্যিই কিন্তু মুশ্‌কিল হবে।

দাহুর ভয় দেখে কনকের চোখ কৌতুকে ঝকমক করে উঠল। বললে, তাহলে ক'লকাতায় বাসা করার কি হবে?

—কি আর হবে? কিন্তু মায়ের এও তো ভাল নয়।

—কেন?

আকাশের দিকে খানিকটা ধোঁয়া ছুঁড়ে দাহু বললেন, নিরীহ অসহায় ভদ্রসন্তানকে হাতের মুঠোয় পেয়ে তাকে জামাই করবার মতলব তো ভালো নয়। আমার মা-বাপ থাকলে কি এতটা করতে সাহস করতেন?

কনক ইঙ্গিতটি প্রথমে বুঝতে পারলে না। পর মুহূর্তেই লাফিয়ে উঠে ছোট ছোট হাতে তাঁর মুখ চাপা দিয়ে বললে, আবার সেই সব কথা!

হালদার সাহেব ধীরে ধীরে ওর হাত দু'খানি নিজের বড় বড় মুঠোয় মধ্যে নিলেন। আলোকিত আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন তিনি

ভাবছিলেন। অকস্মাৎ কনকের মনে হ'ল, তিনি যেন প্রচণ্ড একটা কান্না প্রাণপণ বলে চাপবার প্রয়াস পাচ্ছেন। সে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বললে, আপনি কাঁদছেন দাদু ?

তাঁর কথা কইবার তখন শক্তি নেই। শুধু মুখটি আড়াল করে ঘাড় নাড়লেন।

কনক তাঁর পায়ের গোড়ায় হাঁটু গেড়ে বসে আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলে।

বললে, আপনি কাঁদছেন কেন দাদু ?

মমতায় তার গলার স্বর ভিজে।

দাদু আস্তে আস্তে ওর দু'খানি হাত নিজের কাঁধের উপর তুলে নিলেন। গলাটা ঝেড়ে বললেন, কেন যে কাঁদি, সে কি আমি বললেই বুঝবি দিদিভাই ! আমার মতো বয়স যেদিন পাবি, সেদিন এমনি সন্ধ্যায় নাতি-নাতনিদের মধ্যে বসে নিজের কাছ থেকেই এর জবাব পাবি।

গভীর স্নেহে ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, তোর ঠাকুরমাকে যখন নেপাল নিয়ে যাই, তোর বাবার তখন আমাদের সঙ্গে যাওয়া হল না। সে রইল আমার বাপ-মার কাছে। এখন বুঝছি কেন ?

ওঁর হাঁটুর উপর কপালটা ঘষতে ঘষতে কনক অভিমানভরে বললে, কিন্তু আপনি তো আবার চলে যাবেন।

দাদু হেসে উঠলেন। বললেন, কেন, আমাকে ধরে রাখতে পারবি বলে মনে হচ্ছে না ?

ঘাড় নেড়ে কনক বললে, আপনাকে আমি মোটে বিশ্বাস করি না। আপনি ভারি নিষ্ঠুর।

দাদু এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। বললেন, ওরে, ওরে, আমার নিজেরও এতদিন সেই অহঙ্কার ছিল। এখন বুঝেছি সব মিথ্যা।

রামেন্দুর পড়ায় কিছুতেই মন বসছিল না। শুধু খোলা বই সামনে রেখে কোন রকমে বসেছিল। অবশেষে দাদুর ঘন ঘন উচ্চ হাসির শব্দে আর পারল না। সেও এসে দাঁড়াল।

কনক তখনও দাদুর হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল। তার মনে কেমন একটি অননুভূতপূর্ব দিগন্ত বিস্তৃত অবকাশের আমেজ এসেছে। তার ছোট পৃথিবীতে ছিল কেবল বাবা, মা আর দাদা। নিয়মের কোলে সেখানে পাখীর মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হত। সুযোগ ছিল না বড় করে ডানা মেলবার।

এমন সময় মানবাত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের মতো এলেন তার দাদু। এসেই একটা ঝাপটায় আকাশের সংকীর্ণতা দিলেন মুছে। আজকের চন্দ্রালোকিত আকাশের মতো আরও একটি বিপুল আকাশের সন্ধান সে তার নিজের মনের মধ্যে পেয়ে আত্মহারা হয়ে গেল। স্বপ্নের মত রহস্যময় সে আকাশ।

দাদুর বাঁহাতখানি তখনও তার পিঠের উপর ছিল। ডান হাত দিয়ে রামেন্দুকে কাছে আকর্ষণ করে তিনি বললেন, কি ভাই, ঘরের মধ্যে থেকে ভরসা হল না? দেখতে এলে বোনটিকে নিয়ে পালিয়ে গেলাম কিনা?

কনকের সংকোচ তখন কেটে গেছে। মন তার কোজাগরী রজনীর চাঁদের মতো ঝকমক করছে। সে দাদুর দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগল।

কিন্তু এ বাড়িতে এ রকম রসিকতার আবহাওয়া এই নতুন। রামেন্দু বোনের সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেল। একটা কথাও বলতে পারল না।

দাদু কনকের মাথার চুলগুলি নাড়তে নাড়তে বললেন, দেখছ তো ভাই, কি রকম জমেছে! আবার বলছে ক'লকাতায়....উঃ!

রামেন্দু হেসে বললে, কি হল?

—চিমটি কাটছে!

দাদু পাইপটি ভর্তি করে দেশলাই জ্বাললেন।

ওঁর দেশলাই জ্বালার শব্দে মুখ তুলে কনক বললে, আপনি এত চুরুট খান কেন? বাবা! মিনিটে মিনিটে। কাল ওটা লুকিয়ে রেখে দোব।

—এখন আর ওটা লুকিয়ে রাখিসনে ভাই। সংসারের সবই একে একে হারিয়ে গেল, শুধু এই পাইপটাই রয়েছে। যে কটা দিন আছি, ওটিকে থাকতে দে।

দাদুর কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাস ফুটে উঠল।

রামেন্দু তাড়াতাড়ি বললে, আচ্ছা পাইপের কথা যাক। কিন্তু আপনি কি বাঙালী পোষাক পরেন না?

—না।

—কেন? লজ্জা হয়?

—লজ্জা নয়। অসুবিধা হয়।

রামেন্দু হো হো করে হেসে বললে, চার কোটি লোকের অসুবিধা হয় না, একা আপনারই যত অসুবিধা হয়?

—নেপালে থাকতে হলে এই চার কোটি লোকেরও আমারই মতো অসুবিধা হ'ত।

—কিন্তু এটা তো আর নেপাল নয়।

—না, তবে যে পোষাকে পঞ্চাশ বৎসর ধরে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি, সে পোষাক একদিনে ছাড়া কঠিন।

রামেন্দু চুপ করে রইল।

দাদু আবার হেসে বললেন, ভুলে যেও না, আমি তোমাদের শতাব্দীতে জন্মাই নি। কিন্তু সে ত্রুটি বাংলাদেশে থাকলে যদি বা শুধরে নিতে পারতাম, তারও উপায় রাখলাম না। গেলাম নেপালে, সেখানে এখনও তোমাদের শতাব্দী গিয়ে পৌঁছুতে পারে নি। সুতরাং অনেক জায়গায় আমার সঙ্গে তোমাদের মিলবে না। তা না মিলুক। সকলের সঙ্গে যেসব জায়গায় মিলতেই হবে, তারও তো কোন মানে নেই। কি বল?

হালদার সাহেব হা হা করে হেসে উঠলেন।

চাকর এসে জিজ্ঞাসা করলে, এখন খাবার দেওয়া হবে কি না?

এখন কটা?

—দশটা বেজে গেছে।

হালদার-সাহেব ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ওহো, এত রাত্তির হয়েছে! আমি ন'টার সময় খাই। ঠিক ন'টায়, কাঁটায় কাঁটায়। বুঝলে দিদিভাই, কাল থেকে....

—তাই হবে। আপনি তো বলেন নি।

—না। ওটা খেয়াল ছিল না। আমার আবার সব বিষয়েই ঘড়ি ধরে কাজ কি না!

হালদার-সাহেব একদিনের অনিয়মানুবর্তিতায় বেশ যেন মুষড়ে গেলেন। আরও বিব্রত হলেন ভিতরে গিয়ে, যখন দেখলেন, মেঝের উপর কার্পেটের আসন পেতে খাবার জায়গা করা হয়েছে।

কনক বললে, জুতো বাইরে খুলে রাখুন দাদু। এ বাড়িতে কেউ ঘরের ভিতর জুতো আনে না।

দাদু বাইরে থেকে বিব্রতভাবে ঘরের দিকে চাইলেন। সুরুচিকে বললেন, তবেই তো মুশ্‌কিল করলে ছোটমা। এই পোষাকে মেঝেয় বসা...

সুরুচি তাড়াতাড়ি বললেন, তার আর মুশ্‌কিল কি! ওরে কনক, চাকরটাকে বলতো মা, বাবার শোবার ঘরে একটা চেয়ার আর টেবিল দিতে।

কনক আর থাকতে পারলে না। ফিক করে হেসে বললে, মোটে একটাই তো তোমার টেবিল মা, তাও খাবার টেবিল নয়।

সুরুচি কিছুমাত্র লজ্জিত হলেন না। বিরক্তভাবে বললেন, তা একটা টিপয় দিলেও তো হয় বাপু। তোরা যতক্ষণ তর্ক করিস ততক্ষণ দশটা কাজ হয়ে যায়।

তিনি নিজেই টিপয় সাজাবার জন্যে গেলেন।

এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে খাবারের থালা হাতে নিয়ে বললেন, এই ঘরে আসুন বাবা। জুতো খুলতে হবে না।

হালদার-সাহেব ছোট ছেলের মতো তাঁর পিছু পিছু গেলেন।

শৈলবিহারী একটু পরে একবার এসে বাবার খাওয়ার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার পড়ার ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বসলেন। বিলাতী প্রথায় খাওয়ার ব্যবস্থায় তিনি যে খুব প্রীত হয়েছেন মনে হ'ল না। তাঁর পুণ্যশীলা মা বেঁচে থাকলে এ দুঃসাহস দেখাবার শক্তি কখনও সুরুচির হত না। সঙ্গে সঙ্গে এই ভেবে তিনি গভীর বেদনা অনুভব করলেন যে, শিশুকাল থেকে তাঁর মনের মধ্যে মা যে আচার-পরায়ণতার বীজ বপন করে গেছেন, বাপ এসে প্রথমেই আঘাত করলেন সেইখানেই। এটাকে তিনি খুব ভালোভাবে নিতে পারলেন না। নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

[২]

হালদার-সাহেবের ঘুম ভাঙ্গল দেরিতে। খোলা জানালা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। তিনি একবার চোখ মেলে দেখেই আবার চোখ বন্ধ করলেন। তখনও তাঁর ঘুমের জড়তা সম্পূর্ণ কাটেনি।

পা টিপে টিপে এল কনক। সকালে সে বাগান থেকে ফুল তুলেছে অনেক। এতক্ষণ বাইরে বসে বসে তাই দিয়ে একটি তোড়া তৈরী করছিল। অত্যন্ত সন্তর্পণে সেটা দাদুর খাটের পাশের ফুলদানিতে সাজিয়ে আবার তেমনি পা টিপে টিপে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ আঁচলে টান পেয়ে ফিরে দাঁড়াল।

—ওকি! আপনি জেগে আছেন?

—নিশ্চয়। কিন্তু তুই খুব হতাশ হয়ে গেলি দিদিভাই। ভেবেছিলি আর কেউ তোর আঁচল ধরে টানলে, না?

কনক সকৌতুকে মাথা নেড়ে চুপি চুপি বললে, হ্যাঁ। ভীষণ হতাশ হয়ে গেছি দাদুভাই। ভেবেছিলাম আমার আঁচল ধরে টানবার জন্যে রাজ্যের যত মদন-মোহন আপনার খাটের নীচে কাল রাত থেকে লুকিয়ে আছে।

কনকের সাহস বেড়ে গেছে। কিন্তু এ বাড়ির সংস্কার এখনও আছে। তাই চুপি চুপি বললে। কিন্তু জোরে বলতে সাহস করলে না, পাছে কারও কানে যায়।

দাদু সশব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, থাকবে, থাকবে। দুদিন সবুর কর না। তখন এই বুড়ো দাদুভাই-এর কাছেই পরামর্শ নিতে

আসতে হবে। বাঃ! চমৎকার তোড়া বেঁধেছিস তো। দেখি, দেখি!

গর্বিত পুলকে কনক ফুলদানিটি ওঁর হাতে তুলে দিলে।

হালদারসাহেব যেন লাফিয়ে উঠে বসলেন। তোড়াটি হাতে নিয়ে বার বার তার আঘ্রাণ নিলেন, গভীর স্নেহে আঙুলের প্রান্ত দিয়ে তোড়াটি বার বার স্পর্শ করলেন। তারপর একটা বাহু সামনে প্রসারিত করে বক্তৃতার ঢঙে বললেন, এই আনন্দের জন্যে আজ সকালে তোমায় আমি আশীর্বাদ করি :

And shall pleasure overflow
Thy cup with sweetness, thou shalt taste
Nothing but sweetness, and shalt grow
Half sad for sweetness run to waste

কনক হাত বাড়িয়ে ওঁর পায়ের ধূলো নিলে।

সুরুচি এলেন চা নিয়ে।

হালদারসাহেব গভীর বিস্ময়ে ওঁর দিকে চাইলেন। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, আমার যে সকালে উঠেই চায়ের প্রয়োজন হয় সে তুমি কি করে জানলে ছোটমা?

সুরুচি অদূরে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, ছোটমা হ'তে গেলে না জেনে উপায় কি!

—তা ঠিক, ছোটমাকে কি জানতে হয়? জানা থাকে। কি বলিস কনক?

হালদার-সাহেবের নিজের বাপ-মাকে মনে পড়ল। তাঁরা কিন্তু তাঁকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ক্ষমা করে যেতে পারেন নি। এমন কি মৃত্যুর পরে তাঁর হাতে পিণ্ড নিতে পর্যন্ত অস্বীকৃতি জানিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, পরের মেয়ে হঠাৎ মা হয়ে কি করে তাঁকে ক্ষমা করে যাচ্ছেন। নিজের মা যা পারেন নি, পরের মা তাই অত্যন্ত সহজে পারে কেমন করে? এত বড় বিস্ময় কি করে সম্ভব হয়! কিন্তু সে পুরোনো কথা তাঁর আর পাড়তে ইচ্ছা হ'ল না। অন্যের অগোচরে কথাটা শুধু তাঁর নিজের মনকেই নাড়া দিয়ে গেল।

কনক বললে, দাদুভাই, আপনার আর কি কি অভ্যাস আছে আপনি একে একে বলে যান, আমি খাতায় টুকে নিই।

সুরুচি হেসে ধমক দিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা। তোমাকে আর টুকতে হবে না, তুমি খুব গিন্নী হয়েছ!

হালদার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, শৈলকে দেখছি না ছোটমা, সেকি বেরিয়েছে?

জবাব দিলে কনক। বললে, তিনি আহ্নিকে ব'সেছেন।

—আহ্নিকে! সে আবার পুজো-আহ্নিক করে নাকি?

—হ্যাঁ।

কনক সংক্ষেপে জবাব দিলে। দাদুর কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন পরিহাসে সে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'ল।

দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, রামেন্দু কোথায়? সেও কি আহ্নিকে বসেছে না কি?

দাদুর কথায় কনক হেসে ফেললে। বললে, না। সে কুস্তি করছে!

—কুস্তি! কোথায়?

কনক আঙুল দিয়ে বাড়ির পিছনের একটা দিক নির্দেশ করে বললে, ওই দিকে খানিকটা জায়গা নিজেই খুঁড়ে নিয়ে দাদা একটা কুস্তির আখড়া তৈরী করেছে। একজন ওস্তাদও রেখেছে কুস্তি শেখাবার জন্যে।

—বাঃ! বাঃ! বেশ ভালো তো।

বোঝা গেল, আহ্নিকের চেয়ে হালদার-সাহেবের কুস্তির সম্বন্ধে উৎসাহ বেশি।

কনক জিজ্ঞাসা করলে, আপনাদের সময়ে এ সবের চলন খুব বেশি ছিল, না দাদু?

—মোটেই না, আমাদের কেবল পোষাকী সাহেবিয়ানার দিকেই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু নেপালে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট চর্চা আছে। বিশেষ করে শিকারে....

—আপনি শিকার করতে পারেন?

—পারতাম, নেপাল দরবারের মতো জায়গাতেও আমার শিকারী বলে নাম ছিল। বুড়ো হয়েছি এখন হাত কাঁপে। কি জানি এখন পারি কি না।

অজ্ঞাতসারেই হালদারসাহেব একবার শিরাবহুল হাতখানির উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। আপন মনেই বললেন, Good, very good. কুস্তি জিনিসটি খুব ভালো। শরীরের স্ফুর্তি বাড়ে। কিন্তু শ্রীমতী কনকলতা হালদার, তুমি কি পার, সেতো জানবার এখনও কোনো সুযোগ পেলাম না।

কনক মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, আমি খুব চিমটি কাটতে পারি।

—সে পরিচয় তো আসামাত্র দিয়েছ। আর কিছু?—

সুরুচি বললেন, ও খুব ভালো গাইতে পারে।

—তাই নাকি! তা হলে তো কাল খুব ফাঁক গেছে। আচ্ছা, আজ সন্ধ্যেবেলায় তার শোধ নেওয়া যাবে।

হালদারসাহেব জোরে জোরে হাসতে লাগলেন।

সুরুচি চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে চলে গেলেন। তখনি ফিরে এসে বললেন, বাথরুমে আপনার স্নানের জল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে কি গরম জলের দরকার হবে?

—কিছুমাত্র না। কিছুমাত্র না।—হালদার সাহেব চটি পায়ে দিতে দিতে বললেন, সে নেপালে দরকার হ'ত। কিন্তু আমার টুথপেস্ট আর ব্রাশটা বার করতে হবে যে দিদিভাই।

সুরুচি বললেন, সব বাথরুমে রেখে দিয়েছি। আপনার চাবি তো আমার কাছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাবি তো তোমাকে দিয়েছি।

হালদারসাহেব বাথরুমে গেলেন।

এমন সময় রামেন্দু এল। তার স্নান শেষ। কুস্তির পরে, একবারে স্নান সেরে সে পড়তে বসে। জিজ্ঞাসা করলে, দাদু উঠেছেন?

—হ্যাঁ, তিনি বাথরুমে গেছেন। সুরুচি বললেন, তোমাকে একবার বাইসিকেলটা নিয়ে চট্ করে পেঠিয়া থেকে ঘুরে আসতে হবে যে বাবা!

—পেঠিয়া কেন?

—তোমার দাদুর জন্যে একটু মাংস আনতে হবে। লক্ষ্মী মাণিক, ফিরে এসে পড়তে বসবে।

রামেন্দু এবং কনক দু'জনেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মায়ের দিকে চেয়ে রইল।

রামেন্দু চোখ বড় বড় ক'রে বললে, মাংস কি মা! এ বাড়িতে মাছ ঢোকে না যে!

বিরক্তির ভাবে সুরুচি বললেন, সে যাদের জন্যে ঢোকে না, তাদের জন্যে ঢোকে না। বাবার জন্যে রোজ একটুখানি মাংস চাই। ওঁর সেইরকমই অভ্যেস।

রামেন্দু বিজ্ঞের মত বললে, তোমার বাবার কথাটা বুঝলাম মা, কিন্তু আমার বাবার কথাটা কি জানা দরকার ছিল না?

সুরুচি এবার কঠোর কণ্ঠে বললেন, দরকার থাকে সে আমি বুঝবো। তুমি তর্ক না করে যা বলছি তাই শোন।

রামেন্দু আর কথা বাড়াতে সাহস করলে না। মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বাইসিকেলে বেরিয়ে গেল।

বাথরুম থেকে হালদারসাহেবের বেরিয়ে আসার সাড়া পেয়ে সুরুচি ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। যাবার সময় কনককে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে বলে গেলেন, যদি হালদারসাহেবের কোনো কিছু দরকার হয়। হালদার-সাহেব এ ঘরে ফিরে আসার অল্পক্ষণ পরেই সুরুচি এলেন। তাঁর হাতে একটি প্লেটে দুটি অর্ধসিদ্ধ ডিম, খান দুই টোস্ট নরম করে ভাজা।

সেগুলি হালদারসাহেবের সামনের টিপয়ে রেখে বললেন, আপনার চা নিয়ে আসছি।

তাঁর পিছু পিছু কনকও বেরিয়ে এল। চুপি চুপি মাকে বললে, ওগুলো কিসের ডিম জানতো মা?

—জানি, তুই চুপ কর।

—তা না হয় করলাম, কিন্তু বাবা জানতে পারলে আস্ত রাখবেন না যে!

—তাঁকে জানাবারই বা তোমার এমন কী তাড়া পড়েছে?

—না, তাই বলছি। কিন্তু এগুলো সিদ্ধ করলে কে? ঠাকুর তো ছোঁবে না। তুমি নিজে?

—তোমার অত খবরের দরকার কি শুনি ?

কনক হেসে বললে, কিছু দরকার নেই। আমি বলছিলাম, তোমার বাবার জাততো জাহান্নমে গেছেই, আমার বাবার জাতটি আর সেখানে পাঠিও না।

এবার সুরুচি হেসে ফেললেন। বললেন, তোমাদের সব্বারই জাত ঠিক ঠিক থাকবে মা। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ওঁর খাওয়ার কাছে একটু দাঁড়াওগে।

তিনি দ্রুতপদে চা আনতে গেলেন।

ব্রেকফাস্টের পর হালদারসাহেব দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে মনোযোগের সঙ্গে দৈনিক খবরের কাগজ পড়ছিলেন। চীন-জাপান যুদ্ধ, ইংলণ্ডের রণসজ্জা, চেকোশ্লোভাকিয়ার আর্তনাদ, হিটলারের হুংকার এবং সেই সঙ্গে চুরুটের ধোঁয়া,—সমস্ত মিলে তাঁর চোখে পৃথিবীটাকে একটা ধোঁয়ায় ভরা কাগজের ফানুসে পরিণত করে দিয়েছিল। সেই পৃথিবী এখন ক্রমাগত আকাশের দিকে তর তর ক'রে উঠছে, বাইরের দর্শকরা ঘন ঘন করতালি দিচ্ছে, কিন্তু কোন মুহূর্তে যে আগুন ধরে যাবে কেউ জানে না। এ দিকে ভারতেও কংগ্রেস, দেশীয় রাজ্য, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা নিয়ে নানা লোকের জল্পনাকল্পনা, অনিশ্চিত অনুমান, সুনিশ্চিত অনুমান উদ্দাম হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর দুর্ভাবনা ভেবে জীবনের সায়াহ্নকালেও হালদারসাহেব ক্রমশঃই বিচলিত হয়ে উঠছিলেন। এমন সময় কনক তারই বয়সী আর একটি মেয়েকে টানতে টানতে এনে তাঁর সামনে হাজির করলে।

তারই বয়সী, কিন্তু তবু যেন এক ফোঁটা মেয়ে। কনকের মত ফর্সা

নয়, অত লম্বা নয়। স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও দুর্বল। লিক লিকে হাতে ঢলঢল করছে দু'গাছা করে সরু চুড়ি। গলায় একগাছি সরু হার। চোখে শেলের চশমা ছেলেমানুষি মুখখানায় কেমন একটা নতুনতর শ্রী দিয়েছে। তার আড়ালে উঁকি মারছে বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চোখ, আয়ত কিন্তু কোটরপ্রবিষ্ট। হোক শ্যামবর্ণের মেয়ে। কিন্তু শ্রী আছে।

কনক বললে, আমার বন্ধু লিলি সরকার। এই সামনের বাড়িটা এদের। এর বাবা মিঃ এ, জি, সরকার এখানকার হিস্ট্রির প্রোফেসার, আপনাকে দেখবার জন্যে সকাল থেকে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

লিলি হালদারসাহেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

হালদারসাহেব খবরের কাগজটা এক পাশে ঠেলে রেখে বললেন, বস, বস।

ওরা দু'জনে দু'খানা চেয়ার টেনে বসল।

কনক আবার বললে, আপনাকে দেখবার জন্যে লিলি সকাল থেকে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

হালদারসাহেব সহাস্যে বললেন, হবারই কথা।

লিলিকে বললেন, তুমিও কলেজে পড় ?

—আমরা একসঙ্গেই পাস করেছি। ও বেথুনে পড়ে, আমি পড়ি ডায়োসিসানে।

কনক বললে, গ্রীষ্মের ছুটির মুখে না এলে কিন্তু আমাদের কারও দেখা পেতেন না।

হালদারসাহেব হেসে বললেন, সে রকম অসময়ে আসব কেন ? তোমাদের সঙ্গে আমোদ করবার জন্যেই তো আসা। তোমার নামটি কি বললে ? লিলি ? বেশ বেশ। Good ! ও ছোটমা ? দেখে যাও একবারটি।

সুরুচি রান্নাঘরে কি যেন করছিলেন। ডাক শুনে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ালেন।

লিলিকে ভাল করে দেখবার জন্যে হালদারসাহেব তখন চশমা খুলে ফেলেছেন। সুরুচিকে দেখে উৎফুল্ল হ'য়ে বললেন, দেখ দেখ ছোটমা। এসেই আমার কত বন্ধু জুটে গেল দেখ। এর নাম লিলি সরকার।

তাঁর কাছে লিলির পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস দেখে সুরুচির মনে মনে হাসি এল। কিন্তু তিনি মুখে গাম্ভীর্য রেখে বললেন, হ্যাঁ। কনকের বন্ধু। বড় ভালো মেয়ে। গেল বার জলপানি পেয়েছে।

হালদারসাহেব সবিস্ময়ে বললেন, হুঁ? জলপানি-পাওয়া মেয়ে দেখবার বরাবরই খুব আগ্রহ ছিল। বাঃ! Good.

কনক হেসে বললে, দাদুর সবেতেই Good.

—Good নয়? বলিস কি কনক! মেয়েছেলে জলপানি পেয়েছে....

কনক এবার জোরে জোরে হেসে বললে, আপনাদের সেকাল আর নেই দাদু। এখন মেয়েরাই জলপানি পায়। ছেলেরা কোণ নিয়েছে।

—সত্যি? আনন্দে আর উৎসাহে হালদারসাহেব চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন,—Good. এই আমি চেয়েছিলাম! আশ্চর্য! অবশ্য আমি চেয়েছিলাম বলেই যে এমনিটি ঘটেছে তা নয়। তবু.... Strange!

হালদারসাহেব কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ওরা দুই বন্ধুতে এই ভাবান্তর দেখে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে। কিন্তু সুরুচি পিছনে ছিলেন, এত লক্ষ্য করেন নি।

বললেন, লিলি খুব ভাল নাচতে পারে, জানেন বাবা!

—সত্যি? কি নাচ? ফক্সট্রট? ও! এই সব দিশি নৃত্য! হংস নৃত্য, সর্প নৃত্য, গণেশ নৃত্য! ও সব জানি না।

সুরুচি আর দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গত মনে করলেন না। হাসি চেপে সরে পড়লেন। রান্নাঘরে তাঁর কাজও ছিল।

মাকে চলে যেতে দেখে কনক আরও কাছে সরে এল। বললে, আপনি বুঝি শুধু ফক্সট্রট জানেন?

—জানতাম। তা হোক। তোমার ওই নাচই আজ দেখব লিলি। এইখানে। কিংবা এক কাজ করলে হয়। শালবনে ফুল ফুটেছে। বিকেলের দিকে ওইদিকে বেড়াতে যাওয়া যাবে। কি বল? Good. কনক নাকি ভাল গাইতে পারে। তুমি নাচতে পার। শালের বনে ফুল ফুটেছে।

লিলি মৃদুকণ্ঠে বললে, মহুয়া আছে। পলাশ।

—আছে? বাঃ! সকালটা তো বেশ জমে গেল দেখছি। ও-ছোটমা।

সুরুচি আবার ফিরে এলেন।

—তোমার কিছু ভয় নেই ছোটমা। এ যে চমৎকার জমে গেল! এতটা আমি আশা করি নি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার ছোটমা। তিন মাসের মধ্যে আমার এখান থেকে নড়বার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাবে না।

সুরুচি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, বললেন, তার পরেও প্রকাশ পেতে পাবে না, অন্তত আমি থাকতে নয়।

হালদারসাহেব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, বেশ লাগছে জায়গাটা। কিন্তু এদেরও রাখতে হবে,—কনক আর লিলিকে।

কনক বললে, বেশ! আমাদের কলেজ নেই বুঝি?

—কিছু দরকার নেই। আমি পড়াব।

বাজার থেকে রামেন্দু ফিরল মাংস নিয়ে। ভিতরে মাংসটা পৌঁছে দিয়ে এদের কাছে এসে দাঁড়াল।

হালদারসাহেব তার বলিষ্ঠ দেহ দেখতে দেখতে বললেন, এই যে দাদুভাই, কুস্তি হয়ে গেল ?

রামেন্দু সহাস্যে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

—দেখি তোমার শরীরের কি রকম উন্নতি হল ?

হালদারসাহেব ওর জামার বোতাম পট্ পট্ করে খুলে দিয়ে বুকে দুটো থাপ্পড় দিলেন।

—Good ! এই তো চাই। মানুষের রূপ হল তার স্বাস্থ্যে, আর সব গৌণ। চমৎকার ! তুমি শিকার করতে পার ?

—না।

—পারা উচিত। ওতে স্নায়ুর শক্তি বাড়ে। সাহস বাড়ে। নেপালে সবাই অল্পবিস্তর শিকারী। ওটা ওদের খেলার অঙ্গ। শৈলর বন্দুক নেই ?

কনক বললে, বাবা হিংসা পছন্দ করেন না।

—না করুন। আমার বন্দুক আছে। তোমাকে আমি কি ক'রে বন্দুক ব্যবহার করতে হয় শিখিয়ে দোব। আগে টার্গেট প্র্যাকটিস করবে। তারপর ছোট ছোট শিকার, মানে পাখী-টাখী। তারপরে big game. আমি শিখিয়ে দোবো। শৈল কোথায় ?

রামেন্দু বললে, তিনি পড়ছেন। ডেকে দোব ?

—না, থাক।

হালদারসাহেব আবার অন্যমনস্ক হলেন। তারপর কি ভেবে আপন মনেই হতাশভাবে মাথাটা নাড়লেন। শেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

রামেন্দু বললে, সুযোগ তো কখনও পাইনি। তবু শিকারের বইটই যখন পড়ি, ভারি দুঃখ হয়। মনে হয় আমার যদি একটা বন্দুক থাকতো !

হালদারসাহেব সমস্ত অন্যমনস্কতা ঝেড়ে আবার খাড়া হ'য়ে উঠলেন। বললেন, মনে হবারই কথা যে। প্রত্যেক লোকের মনে হওয়া উচিত। তা তুমি আমার বন্দুকটা নিতে পার। ওটা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম।

কনক হেসে বললে, তবেই হয়েছে। দাদা যা ভীতু, রাত্রে একলা বাইরে বেরুতে পারে না।

রামেন্দুর ভীরুতা বোধ হয় সকলেরই সুপরিচিত। লিলিও হাস্য গোপন করবার জন্যে মুখে আঁচল চাপা দিলে এবং বিব্রতভাবে রামেন্দু শুধু বললে, আহা! খুব ইয়ার্কি করতে শিখেছিস!

কিন্তু এত বড় দুঃসংবাদের পরেও তার সম্বন্ধে হালদারসাহেবের উৎসাহ নিবে গেল না। তিনি হাত নেড়ে বললেন, ও সব কিছু না, কিছু না। আমি বলছি, কিছু না। কোন মানুষই যথেষ্ট ভীতু নয়, আবার কাউকেই যথেষ্ট সাহসী বলতে পার না। সব অবস্থার উপর নির্ভর করছে।

কনক বললে, কিন্তু দাদা যে আলো রাত্রেও বেরুতে পারে না। ওর যত বীরত্ব ঘরের ভিতর।

হালদারসাহেব বললেন, আবার এমন লোক পাবে, যে বাইরে বাঘ, বাড়ির ভিতর কেঁচো। আমি তোমার কাছে মাথা তুলতে পারি না, কিন্তু লিলিকে দেখলেই আস্ফালন বাড়ে। তোমার কিন্তু যত ভয় লিলিকেই, আমাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দাও। তার থেকে কি বোঝা গেল? উঁ? মেজর আর্মস্ট্রং কামানের গোলার সামনে অবহেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু উপরওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে থর থর ক'রে কাঁপে। উঁ?

হালদারসাহেব হেসে বললেন, ভয় আর সাহস, দুটো জিনিসই.... উঁ?—**Relative**-এর বাংলা কি?

লিলি বললে, আপেক্ষিক।

—Thank you—হালদার সাহেব বললেন, ও দুটোই আপেক্ষিক। অর্থাৎ একা একা ভয় পাওয়াও চলে না, সাহস দেখানোও চলে না। ওর জন্যে আর একটা দ্বিতীয় পক্ষ চাই। উঁ? আমি এমন লোককে জানি সোমবার পর্যন্ত যার ভীরুতা পরিচিত-লোকের পরিহাসের বস্তু ছিল। মঙ্গলবারের দিন সে হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসল যে, ইতিহাসে তার নাম উঠে গেল।

তাঁর কথার সত্যতা ওরা তিনজনেই মনে মনে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিল।

লিলি বললে, তা কি হয়?

চকচকে টাক মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে হালদারসাহেব বললেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই-ই হয়। আমরা ভুলে যাই, আমের টুকরির মতো মানুষের গায়ে নিশ্চয় করে লেবেল মারা যায় না। তার পরে অত্যন্ত সহজে চেনা লোককে আমরা ভুল বুঝি। অনেক সময় bullyকে ভাবি বীর, সুসংযত শান্ত ভদ্রলোককে ভাবি ভীরু। হুঁ? আমার টুব্যাকো?

কনক ভিতর থেকে তামাক নিয়ে এল।

পাইপ ধরিয়ে হালদারসাহেব আবার বললেন, হুঁ। সাহসী হবার জন্যে আসলে কি চাই জান? অপর পক্ষের দুর্বলতার সন্ধান। আর খানিকটা nerve. তুমি বাঘ শিকার করতে চাও? Good. বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার আগে তোমাকে জেনে যেতে হবে কোথায় বাঘের দুর্বলতা। প্রথমবার তবু হয়তো ভয় হবে। সেজন্যে ভালো শিকারীর সঙ্গে যাওয়া উচিত। তারপর একবার যেই উৎরে এলে, ভয় কেটে গেল, অমনি সমগ্র ব্যাঘ্র-সম্প্রদায় তোমার মুঠোর মধ্যে এসে গেল। হুঁ?

লিলি জিজ্ঞাসা করলে, আপনি অনেক পাখী, বাঘ শিকার করেছেন নিশ্চয় ?

—অনেক। কিন্তু যারা শিকার করা দেখেনি, তাদের সে সব গল্প বলে মনে হবে। রামেন্দু, তোমাকে আমার বন্দুকটা দেখাইগে চল। তোমরাও আসতে পার ইচ্ছা করলে।

ওরা সবাই বন্দুকের কলকব্জা দেখতে ভিতরে গেল।

একটা ছোট টেবিল হাত-গাড়ীতে ক'রে এগারোটার আগেই এসে পৌঁছুল। শব্দ পেয়ে শৈলবিহারী বাইরে এলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি ?

—বলছি।

সুরুচি চাকরদের হুকুম দিলেন, টেবিলটা হালদার সাহেবের ঘরে রাখবার জন্যে। অনেকগুলো চাকরে সেটা ধরাধরি করে সেই দিকে নিয়ে গেল।

সুরুচি এবার স্বামীর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, কি বলছিলে বল ?

—জিগ্যেস করছিলাম, আবার একটা টেবিল কেন ?

—বাবার খাবার টেবিল।

—এ বাড়িতে কি অতঃপর টেবিলে খাওয়া হবে ?

—সকলের জন্যে নয়। কেবল বাবার জন্যে।

শৈলবিহারী তিক্তকণ্ঠে বললেন, তোমার মাকে মনে পড়ে ?

—পড়ে। কিন্তু মায়ের হুকুম আমাদের জন্যে, বাবার জন্যে নয়। আবার এও বলি, মায়ের যেমন হুকুম দেবার অধিকার ছিল, বাবারও তেমনি অধিকার আছে।

—বাবার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না।

—জানবার প্রয়োজন কি ?

সুরুচির কাছ থেকে চটপট জবাব পেয়ে শৈলবিহারী শুধু একবার বলিলেন, হুঁ। তারপর নিজের পড়ার ঘরে চলে গেলেন। আর সুরুচি গেলেন হালদারসাহেবের ঘরে টেবিলটা গুছিয়ে রাখতে। এ সব বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু চোখে যার শ্রদ্ধা আছে, তার খুব বেশি অভিজ্ঞতার প্রয়োজন করে না।

দুপুরে খেতে বসে হালদারসাহেব অবাক্! ঠিক যে খাবার তিনি খান এবং ভালোবাসেন তাই রয়েছে সামনে। চিনে মাটির প্লেট এবং কাঁটা চামচ ঝকমক করছে। বোধ হয় ঘণ্টা কয়েক আগের কেনা।

বললেন, এ সব আবার কেন ছোটমা ? এত হাঙ্গামার তো কিছুমাত্র দরকার ছিল না।

সুরুচি হেসে বললেন, হয়েছে। আপনি খেতে বসুন দেখি। মায়ের সঙ্গে ছেলেদের তর্ক করতে নেই।

খেতে খেতে হালদারসাহেব বললেন, আচ্ছা, তা যেন করলাম না। কিন্তু তুমি ক্রমশই ভাবিয়ে তুলছ ছোটমা, এ আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমি কিছুতে ভেবে পাচ্ছি না, আমি কি খাই আর খেতে ভালোবাসি—তুমি টের পাচ্ছ কি করে ?

—তার জবাব তো সকালেই দিয়েছি।

—ঠিক। কিন্তু সে জবাব আমি না হয় মেনে নিলাম। লোকে তো মানবে না।

—সে লোকের ইচ্ছা। আমাদের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

কনক আর থাকতে পারল না। ঝংকার দিয়ে বললে, আপনি যেন

কী দাদু! কাল রাত্রে খাবার সময় মা সব কথা টুকটুক করে জেনে নিলে, টের পেলেন না?

হালদার-সাহেবের এতক্ষণে গত রাত্রের কথা মনে পড়ল। তাই তো বটে! তিনি অপ্রস্তুত হয়ে জোরে জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, ঠিক! তাই তো ভাবছি....উঁ?

সুরুচি বললেন, কেন, মায়ে যে ছেলের মনের কথা টের পায় একি আপনি বিশ্বাস করেন না?

হালদারসাহেব মুখ নীচু করে খেয়ে যেতে লাগলেন। হঠাৎ এক সময় বললেন, সব মায়েই কি ছেলের মনের কথা টের পায় ছোটমা?

—সব মায়েই।

কিন্তু সব ছেলের মনের কথা নিশ্চয়ই টের পায় না।

শ্বশুরের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সুরুচি যেন থেমে গেলেন। দ্বিধাভরে বললেন, কি জানি।

খাওয়ার সময় হালদারসাহেব আর একটা কথাও বললেন না। আহারান্তে বিশ্রামের আয়োজন করতে লাগলেন। চাকর এসে টেবিল পরিষ্কার ক'রে প্লেটগুলো নিয়ে গেল। সুরুচি ঘরের দরজা-জানালা বেশ ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে গেলেন। কনককে সাবধান করে দিয়ে গেলেন, বেলা না পড়লে তাঁকে যেন ডাকা না হয়।

সাড়ে চারটেয় হালদারসাহেব উঠলেন। দিনের বেলায় ঘুম তাঁর হয় না, নিঃশব্দে পড়ে থাকেন। তা'তে দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতা বেশ উপভোগ করা যায়। কোথায় ডাকছে একটি বিরহ-ব্যাকুল ঘুঘু, কটি চড়ুই পাখী খড়খড়ির ওপাশে কিচির মিচির করছে, কলতলায় কটি

কাকে বাধিয়েছে কলরব, দূর আকাশের কোল থেকে ভেসে আসছে চিলের শীর্ণ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, বাইরে থামের কার্নিসের উপর একটি গৃহবলিভুক্ পারাবত ঘুরে ঘুরে করছে প্রেম-নিবেদন, চালের কোণে একটি কাঠবিড়ালী কুটুর কুটুর করে কি যেন টুংছে ; বেশ লাগে। এ যেন বন্দী মনকে বাইরের বিস্তীর্ণ আকাশের মধ্যে উড়িয়ে দেওয়া। এই তাঁর মধ্যাহ্নকালের বিশ্রাম।

সাড়ে চারটের সময় তিনি উঠলেন। পাঁচটায় এল চা। খানিক পরে এল লিলি, একেবারে সেজে-গুজে।

ওর সজ্জার দিকে চেয়ে হালদারসাহেব বলেন, Good.

পাশের ঘর থেকে কনক সাড়া দিলে, Very good.

—ও কনক !

—যাচ্ছি দাদুভাই। এক মিনিট।

এক মিনিট পরে কনক এল। ওরা দুজনে পরামর্শ করে সাজ ক'রেছে। দু'জনেরই পরনে ফিকে বাসন্তী রঙের ক্রেপ সিল্কের শাড়ী। কচি পাতার রঙের ব্লাউস, আর খোঁপায় একটি করে টকটকে লাল পলাশ ফুল।

উল্লসিত হয়ে হালদারসাহেব বলেন, Good. আমাদের বসতে হবে কোথায় জান ? একটি পলাশ গাছের নীচে। চল।

তিনজনে বাহু জড়াজড়ি করে চল্‌ল বনের দিকে।

বন এদিকে ঘন নয়। শাল এবং আমলকীই বেশি। মাঝে মাঝে পলাশ, মহুয়াও আছে। পাতলা পাতলা করে সাজানো। নানা রঙের ফুলে বন যেন আলো হয়ে আছে। একটি উপলব্যথিতা সংকীর্ণ গিরিনদী অজগর সাপের মতো এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে। তারই ধারে তিনখানি পাথরের উপর তিনজনে পাশাপাশি বসলেন। হালদারসাহেব

শিশুর মতো মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চান, আর থেকে থেকে বলেন, Good. Very good.

তাঁর প্রশস্ত ললাটে, কাশ ফুলের মতো ধবধবে শাদা দাড়িতে পাতার ফাঁক দিয়ে শেষ অপরাহ্ণের আলো এসে পড়েছে। বড় বড় চোখ আনন্দে জ্বল জ্বল করছে। কি কথা ভেবে থেকে থেকে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠছে তিনিই জানেন। ওদের মনে হল, অরণ্যের দেবতা স্বয়ং এসে ওদের মধ্যখানে বসেছেন। কারও মুখে কথা নেই। থেকে থেকে টুপ টুপ করে গাছ থেকে পাতা পড়ছে ঝরে। অত্যন্ত ক্ষীণ কল্লোলে সংকীর্ণ নদীটি চলেছে বয়ে।

হালদারসাহেব বললেন, একটা কবিতা শুনতে ইচ্ছা করছে। পার শোনাতে? বেশ ভালো একটা কবিতা।

কনক লিলির দিকে চাইলে।

লিলি আপত্তি করলে না। মুখ নামিয়ে পরিষ্কার মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল :

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোত খানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;

উল্লসিত হয়ে হালদারসাহেব বললেন, Good.

লিলি আবৃত্তি করে চলল :

এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'
সুদূরের লাগি'।
হে পাখা বিবাগী !
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে
"হেথা নয়, হোথা নয়, আর কোনখানে।"

লিলি চমৎকার কবিতাটি আবৃত্তি করলে। নতমুখে, নতনেত্রে হালদারসাহেব নিঃশব্দে কবিতাটি শুনে গেলেন। কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ মেলে ওদের দিকে চাইলেন।

অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে বললেন, Good. রবীন্দ্রনাথের কবিতা। ওঁর সব কবিতা আমি পড়েছি। সময় পেলেই পড়ি। Good.

লিলি বললে, আপনি একটি কবিতা আবৃত্তি করুন।

কনক যোগ দিলে, হ্যাঁ দাদু।

—কিন্তু এরপরে আর কারও কবিতা তো জমবে না ভাই। তবু একটা করি। আজকে আমায় কেমন যেন কবিতায় পেয়েছে।

একটু থেমে দাদু আবৃত্তি করতে লাগলেন :

Endymion, glistering from the morning stream
In beautiful cold youth with virgin eyes
Sprang naked up the Latvian steep, and stood
In the red sunrise shaking from his hair
The river drops, and laughed, he knew not why.

অকস্মাৎ যেন তাদেরই পদনিম্নের নদীজলতল থেকে লাফিয়ে উঠল এণ্ডিমিয়ন স্বয়ং। দুটি নলিন নয়নে নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্লেখা। কিশোর কুমার। তার অকারণ কলহাস্যে অরণ্যভূমি উঠল শিউরে। তার পরে তারায় ভরা কালো আকাশে উঠল বসন্ত শশী, এমনি সময়ে একটি ফোঁটা বৃষ্টির মতো আকাশ থেকে পিছলে নেমে এল সেলেনি। 'এণ্ডিমিয়ন'! কে যেন ডাকলে তার নাম ধরে। চক্ষের পলকে 'He feels Selene naked in his arms' বললে :

Ah ! Ah! what hast thou done ! for I am thrilled
With perils in the enchanted dawn of Time.
And I begin to sorrow for strange things
And to be sad with men long-dead : O now
I suffer with old legends, and I pine
At long sea-glances for a single sail.

সূর্য অস্ত যায়। দূরে রাঙা মাটির মাঠ আরও রাঙা হয়ে উঠল। অরণ্যতলে নামল বিষণ্ণ ছায়া।

মুগ্ধ বিস্ময়ে কনক বললে, চমৎকার!

লিলি বললে, আশ্চর্য! কিন্তু এত বড় কবিতা আপনি মুখস্থ করলেন কি করে?

হালদার সাহেবের চোখ থেকে তখনও স্বপ্নের লেখা মুছে যায় নি। অন্যমনস্কভাবে বললেন, মুখস্থ করি না, মুখস্থ হয়ে যায়। ভগবান ওই একটা আমাকে শক্তি দিয়েছেন, বার দুই পড়লেই মুখস্থ হয়ে যায়।

একটু পরে ওরা উঠে বাড়ির দিকে ফিরে চলল। সূর্য অস্ত গেল। পিছনের বনভূমি, এ পাশের পাহাড় ধোঁয়াটে হয়ে আসছে। অরণ্য শীর্ষে উঠেছে শুক্লা-ত্রয়োদশীর চাঁদ। ওদের ক্ষণে ক্ষণে মনে হতে লাগল স্বর্গ-মর্তের মাঝামাঝি থেকে কে যেন ডাকছে, এণ্ডিমিয়ন! মনে হল, পলাশের ফুলগুলি রাঙা হেসে মাথা নেড়ে বলছে, Good. Very Good.

চুপি চুপি কনক লিলিকে বললে, দাদুকে কেমন লাগল?

চুপি চুপি লিলি বললে, Oh, he is great.

এদিকে রামেন্দুর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে চাইবার ফুরসৎ নেই। সে কখনও বন্দুক নিয়ে শিকারে যাচ্ছে, কখনও বন্দুক সাফ করছে, কখনও বা অকারণেই বন্দুকটাকে অপত্যস্নেহে নাড়াচাড়া করছে। রাত্রে এখনও একলা বাইরে যেতে গা ছম ছম করে। তবে ততটা নয়। কিন্তু বন্দুক নিয়ে দিনের বেলায় গভীর জঙ্গলে শিকারে যেতেও তার বিন্দুমাত্র ভয় করে না। মোট কথা তার জীবনে হঠাৎ একটা মস্ত পরিবর্তন ঘটছে। সে যেন একটা নতুনতর রূপ নিচ্ছে। তারই তরঙ্গে সে সব সময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে।

সঙ্গী জুটেছে অধ্যাপক নরেশ বড়ুয়ার ছেলে বিশ্বমোহন। বয়সে বিশ্বমোহন রামেন্দুর চেয়ে কিছু বড় হবে। কিন্তু মাথায় ছোট, সামর্থ্যেও দুর্বল। ওরা এইখানে একই সঙ্গে পড়ে। ছিপ ছিপে একহারা চেহারা; কিন্তু দুর্জয় তার সাহস। গাছে চড়তে, সাঁতার কাটতে, ফুটবল খেলতে এদিকে তার জোড়া নেই। ফুট ফুটে রঙ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বড় বড় চুল, আর চোখ দেখলেই মনে হয় এক জায়গায় বেশীক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকা ওর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং এ ব্যাপারে ও যে জুটে যাবে তাতে আর বিচিত্র কি! বন্দুকের মেকানিজম্ ও রামেন্দুর চেয়ে আগে আয়ত্ত করে নিলে। কিন্তু বোধ হয় অত্যধিক চঞ্চলতার জন্যে গুলির লক্ষ্য ওর চেয়ে রামেন্দুর ভালো হয়েছে। হিংস্র জন্তু শিকারের মতো লক্ষ্য এখনও ওদের কারও হয় নি। তবে কদিন থেকে কিছু-না-কিছু পাখী শিকার প্রত্যহই করছে। কোনোদিন তিতির, কোনোদিন বটের, একদিন একটি বেলেহাঁসও মেরেছে। বাপের ভয়ে সেগুলো বাড়ী আনতে সাহস করে না। বিশ্বমোহনকে দিয়ে দেয়। ওরা

আবার হালদারসাহেবের জন্যে গোপনে খানিকটা রাঁধা মাংস দিয়ে যায়। তবে সন্ধ্যাবেলায় শিকার আর এ বাড়িতে পাঠাবার প্রয়োজন হয় না। কারণ রাত্রে হালদারসাহেব দুটি ফল আর একটু দুধ ছাড়া কিছুই খান না।

ইতিমধ্যে নরেশবাবু এবং সরকারসাহেব কদিনই সন্ধ্যের দিকে এসে হালদারসাহেবের সঙ্গে আলাপ ক'রে গেছেন। কেবল বিশ্বমোহন এসে কোনদিন পরিচয় করার আগ্রহ প্রকাশ করে নি। করে নি ভয়ে। এদিকে সে যত বড় ডানপিটেই হোক না কেন, সহজে সে পরিচিত বয়স্ক লোকের সামনে পড়তে চায় না। তার উপর হালদারসাহেবের ওই লম্বা-চওড়া চেহারা আর তার সঙ্গে দাড়ি এবং টাকের সমন্বয় দেখে সে রামেন্দু এবং কনকের শত প্রকার অভয় দানের পরেও কিছুতে এগুতে রাজি হল না। ওদের ভাইবোনের ধারণা, হালদার সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে পারাটা একটা মস্ত বড় সৌভাগ্য। সে সৌভাগ্য যে হাতের কাছে পেয়ে ছেড়ে দেয়, তাকে আর বলবার কি থাকতে পারে ?

বস্তুত, বিশ্বমোহন নামে আর একটি ছেলে যে এই চক্রের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হালদারসাহেব তা জানতেও পারেন নি। জানতে পারলেন হঠাৎ একদিন।

ওরা দুজনে তখন বন্দুক সাফ করছিল। প্রত্যহ এ কাজ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ওদের নতুন আকর্ষণ,—ওরা করে। অর্থাৎ, না করেই বা করবে কি ?

সাফ করা হয়ে গিয়েছিল। পাশেই কতকগুলো কার্ট্রিজ পড়ে ছিল। তারই একটা বন্দুকে লাগিয়ে বিশ্বমোহন বোধ হয় একটা গুরুতর রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করছিল।

তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে রামেন্দু বললে, বিশে, তুই আমাকে ডোবাবি দেখছি।

—কেন? কি হল?

কার্ট্রিজটা বার করে রামেন্দু বললে, হয় নি, হ'ত। আমি খুন হ'তাম, তুই ফাঁসি যেতিস, আর দাদু বেচারীর নাকালের একশেষ হ'ত। আর কিছু না।

বিশ্বমোহন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, পাগল! আমি শুধু দেখছিলাম।

সে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। রামেন্দু মুখ তুলে দেখে, হালদারসাহেব ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন।

হালদার সাহেব পরিচ্ছন্ন বন্দুকের দিকে সস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, বাঃ! তোমার হাতে পড়ে বন্দুকটার যৌবন ফিরে এলো দেখছি। আমি তো বহুদিন ওটাতে হাত দিই নি কিনা। নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বেশ!

হঠাৎ বিশ্বমোহনের দিকে চেয়ে বললেন, এ ছেলেটি কে?

রামেন্দু বললে, প্রোফেসার বড়ুয়ার ছেলে। বিশ্বমোহন বড়ুয়া ওর নাম।

—তাই নাকি? Good. কিন্তু এ রত্নটিকে তো এতদিন দরবারে পেশ করনি? এখানে ছিল না নাকি?

—ছিল। কিন্তু আপনার দাড়ির ভয়ে দরবার পর্যন্ত এগুতে সাহস করে নি।

হালদার সাহেব হা হা করে অট্ট হাস্য করে উঠলেন।

—সাহস করে নি? দাড়ির ভয়ে? অ্যাঁ? নতুন খবর বটে! Do you smoke?

হালদারসাহেব ওকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন। তাঁর টোব্যাকো ফুরিয়ে যাওয়ায় ক'দিন থেকে সিগারেট খাচ্ছেন। কিন্তু ওঁর কাণ্ডে ভয়ে বিশ্বমোহনের প্রাণ উড়ে গেল। ভাবলে, নিশ্চয়ই ওকে কোনো দিন লুকিয়ে সিগারেট খেতে দেখেছেন। ওর তালু শুকিয়ে উঠল।

হালদারসাহেব আবার বললেন, নাও না। তার আর লজ্জা কি? সিগারেট এমন কী খারাপ জিনিষ যে, লুকিয়ে খেতে হবে?

বিশ্বমোহন যন্ত্রচালিতের মত সিগারেটটা নিলে। হালদারসাহেব দেশলাই জ্বেলে নিজেরটা ধরালেন, ওরটাও ধরিয়ে দিলেন।

বললেন, তুমি তো রামেন্দুর সঙ্গে পড়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বি-এ পাশ ক'রে কি করবে? এম-এ পড়বে?

বিশ্বমোহন কুণ্ঠিতভাবে বললে, বি-এ পাশ করতে পারব কিনা সেটা এখনও ঠিক হয়নি। তবে যদি পারিও, এম-এ পড়ব না।

—কি করবে?

—ইচ্ছা আছে এরোপ্লেন চালানো শিখব।

হালদারসাহেব উল্লসিত হয়ে ওর করমর্দন করলেন। বললেন, Good. তুমি সত্যি সত্যি শিখতে পারবে কিনা জানি না। কিন্তু তোমার কল্পনার মৌলিকতা আছে, বলিষ্ঠতা আছে, বিশালতাও আছে। Very Good.

রামেন্দুর দিকে ফিরে বললেন, আর তুমি?

ফিকা হেসে রামেন্দু বললে, আমার ভবিষ্যৎ স্থির করার ভার তো আমার হাতে নেই।

—তা জানি। তবু তোমার ইচ্ছাটা কি?

একটুক্ষণ কি চিন্তা করে রামেন্দু বললে, এখন থাক। আর এক সময় বলব আপনাকে।

—তাই বোলো। কিন্তু মনে রেখ, নতুন একটা পথে যাওয়াই খুব বড় কথা নয়। নিজের শক্তি এবং অন্তরের গতিরও আন্দাজ নেওয়া দরকার। কারণ তারই উপর চেষ্টার সফলতা নির্ভর করে।

রামেন্দু জিজ্ঞাসা করলে, সফলতাই কি বড় কথা হল দাদু? চেষ্টাটা কি কিছুই নয়?

কিছুই নয় এ কথা তো বলিনি ভাই। কিন্তু সে চেষ্টারও একটা অর্থ থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথ যদি লোহার কারখানা খুলতেন তা'হলে কারখানার অদৃষ্টে কি হত ভগবান জানেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যের আনন্দ থেকে সমস্ত পৃথিবী বঞ্চিত হ'ত।

বিশ্বমোহন বললে, কিন্তু তিনি যে কারখানায় সফল হতেন না, তাই বা কি করে জানলেন?

দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিয়ে হালদারসাহেব বললেন, অত্যন্ত সহজে। একটা লোক একই সঙ্গে দুটো সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে বড়ো হতে পারে না। অনেক লোক থাকে যারা সব দিকেই কিছু কিছু পারে। তাদের Jack of all trade বলে। কিন্তু যাঁরা কোনো দিকে একেবারে শীর্ষস্থানে ওঠেন, অন্য দিকের কথা তাঁদের ভুলেই যেতে হয়। এক কথায় আজ পর্যন্ত কোন লোহার কারখানাওয়ালা বড় কবি হ'তে পারে নি এবং কোন সত্যিকার কবি বড় লোহার কারখানাওয়ালা হ'তে পারে নি।

রামেন্দু চুপ করে রইল। একটু পরে বললে, কিন্তু আমার মালিক তো আমি নই দাদু?

হালদারসাহেবের চোখ দুটো অকস্মাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল।

বললেন, My dear Sir, আঠারো বৎসরের পরে প্রত্যেক সুস্থদেহ মানুষ নিজের মালিক নিজে। তুমি চিরজীবন খোকা সেজে থাকতে চাও, থেক। কিন্তু সে অবস্থাটা মানুষের পক্ষে খুব শ্লাঘার বস্তু নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

উত্তেজিতভাবে হালদারসাহেব আর একটা সিগারেট ধরিয়ে চলে গেলেন। পরিচ্ছন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে ওরা দুজনে স্তব্ধভাবে বসে রইল।

দিন কয়েক পরে একদিন দুপুরে লিলির ওখানে হালদার সাহেবের নিমন্ত্রণ হ'ল। সকাল থেকে লিলি কোনোটা বা নিজের হাতে, কোনোটা বা নিজের তত্ত্বাবধানে বাবুর্চিকে দিয়ে কত জিনিষই তৈরী করালে। সেই সমস্ত অখাদ্য রন্ধনে কনকের সাহায্য করতে যাওয়ার উপায় নেই। তাহ'লে শৈলবিহারী আর রক্ষা রাখবেন না। কিন্তু তার ভারি ইচ্ছা করছিল, নিজের হাতে সেও কিছু রেঁধে দাদুকে খাওয়ায়। এ বাড়িতে সে সুযোগ পাওয়ার উপায় নেই। সুরুচি এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর। কনক রান্নার কিছুই জানে না। কখনও সে রান্না করেও নি। দাদুর খাবারের উপর দিয়ে তার হাতেখড়ি হতে দিতে তিনি রাজি হবেন না।

অনেক কেঁদে-কেটে কনক পুনরায় তার মাকে অনুরোধ করাতে তিনি হেসে তাকে অমলেট ভাজবার অনুমতি দিয়েছেন। ঠোঁট উল্‌টে কনক বলেছে, চাইনে আমি রেঁধে খাওয়াতে। তোমার বাবাকে তুমিই মনের সাধে খাওয়াও।

কিন্তু এত বড় অভিমানেও তাঁকে বিচলিত হতে না দেখে কনক শেষ পর্যন্ত লিলির সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল।

দাদু যখন খেতে গেলেন, কনক সঙ্গে গেল না। সে কিন্তু ঈর্ষায় নয়, শৈলবিহারীর ভয়ে। শৈলবিহারীর ব্যবহার অকস্মাৎ ভিন্ন পথে বইতে আরম্ভ করেছে। এতদিন ছেলেমেয়েরা দোষ ত্রুটি করলে তিনি তাদের প্রকাশ্যে তিরস্কার করতেন। ব্যাপারটা সেইখানেই চুকে যেত। এখন একটা কথাও তিনি বলেন না। কিন্তু তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন। সুতরাং ব্যাপারটা যে কোথায় শেষ হবে সেই ভেবে ছেলে-মেয়েরা চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

শৈলবিহারী মুখে কিছু বলেন না। কিন্তু কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। রামেন্দুকে গোপনে শিকারে যেতে দেখে তিনি তার পড়ার ঘরে টাঙ্গিয়ে দিয়ে গেলেন, 'অহিংসা পরমো ধর্ম'। মধ্যের হলঘরে টাঙ্গানো হয়েছে তাঁর মায়ের একখানা মস্ত বড় ছবি, যা ঘরে ঢোকামাত্রই চোখে পড়বে। আর উপনিষদের কত যে বাক্য ঘরে-ঘরে এবং ঘেরা বারান্দাতেও ঝুলছে তার আর ইয়ত্তা নেই। আগে মাঝে মাঝে ছেলে-মেয়েদের ডেকে পড়া বুঝিয়ে দিতেন। এখন আর ডাকেন না। ছেলে-মেয়েও সাহস ক'রে তাঁর কাছে যায় না। পূজোর ঘরে তো কোনো কালেই তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না; তাঁর পড়ার ঘরে যেতেও এখন কেউ সাহস পায় না। হালদারসাহেব চলে গেলে ওদের অবস্থা কি যে হতে পারে, দুই ভাইবোনে মাঝে মাঝে তা নিয়ে আলোচনাও করে। কিন্তু কোন দিকে দিশা পায় না।

কনকের খুবই ইচ্ছা ছিল, হালদারসাহেবের সঙ্গে যায়। কিন্তু এই ভয়েই সাহস করলে না। হালদারসাহেব তা বুঝলেন কি না জানা যায় না, কিন্তু কনককে সঙ্গে আসবার জন্যে জেদ করলেন না। লিলি ডাকতে এসেছিল, তার সঙ্গে একাই গেলেন।

সরকারসাহেবের বাড়ির বাইরের চেহারাটা অবিকল শৈলবিহারীর

বাড়ির মতোই, কিন্তু ভিতরটা সম্পূর্ণ পৃথক। প্রত্যেকখানা ঘর সম্পূর্ণ বিলিতি কেতায় সাজানো। সেখানে বাবুর্চি-বেয়ারা, বিলিতি আসবাব। সামনের বাগানে যত বিলিতি ফুলের গাছ। তার বাহার আলাদা। এককথায় বাড়ির ভিতর ঢুকলে বাইরের সাদৃশ্যের কথা মনেই হয় না।

সরকারসাহেব সস্ত্রীক হালদারসাহেবকে সংবর্ধনা করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। খাবার-ঘরের টেবিল চমৎকার সাজানো। সেখানে বাবুর্চি-বেয়ারার ব্যস্ততার এবং কাঁটা-চামচের টুং টাং শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

সরকারসাহেব, বিশেষ ক'রে মিসেস সরকার খুবই অমায়িক। মিঃ সরকার শৈলবিহারীর চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই হবেন বোধ হয়। কিন্তু দেখে তা বোঝা যায় না। মাথায় এঁরও টাক আছে, লম্বাতেও শৈলবিহারীরই মতো। কিন্তু ততটা জবুথবু হয়ে পড়েন নি। মিসেস সরকারও বেশ মেয়ে। সুরুচির মতো অতটা মিষ্টি হয়তো নন, কিন্তু আরও, যাকে ইংরিজিতে বলে bright, তাঁর কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে একটা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আছে। সুরুচির মতো অল্পশিক্ষিতাও নন, রীতিমতো সুশিক্ষিতা। হালদারসাহেব এদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই বুঝলেন, এঁরা সাধারণতঃ যে শ্রেণীর দেশীয় খৃষ্টান চোখে পড়ে, সে শ্রেণীর নন। এঁদের মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ আছে। এঁরা উভয়েই বাঙ্গালী।

মিসেস সরকার হাসতে হাসতে বললেন, আপনাকে দেখিনি কিন্তু আপনার কথা এত শুনেছি সে আর বলবার নয়।

মিঃ সরকার সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ। You are always on Lily's lips.

হালদারসাহেব হাসলেন।

মিসেস সরকার বললেন, আপনাদের দু'জনে নাকি ভারী ভাব হয়ে গেছে।

হালদারসাহেব হাসলেন! বললেন, হঁ্যা। যেমন ভাব হয় ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিউজিয়ামের।

মিসেস সরকার তাড়াতাড়ি বললেন, You don't say that. আপনি....

হালদার সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, মিসেস সরকার, আমি অতীত শতাব্দীর ধ্বংসাবশেষ। আমাকে ওদের ভালো লেগেছে। আমি জানি কেন ভালো লেগেছে। এর মধ্যে সুখের কথা এই যে, আমার ভিতর দিয়ে ওদের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর আত্মার পরিচয় স্থাপিত হচ্ছে। নয় কি?

মিঃ সরকার বললেন, আমিও তো উনবিংশ শতাব্দীর।

—না। আপনারা ঠিক....

বাধা দিয়ে মিঃ সরকার বললেন, আমাকে আপনি 'তুমিই' বলবেন বরং। আমি শৈলবিহারীর বন্ধু।

হালদারসাহেব হেসে বললেন, আচ্ছা তাই বলব। আমি বলছিলাম, তোমরা ঠিক আমাদের শতাব্দীর নও। আমাদের শতাব্দীর fag-end-এ তোমরা এসেছ বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারাকে সঙ্গে নিয়ে। তোমাদের সঙ্গে আমাদের মিল কম। অনেক ক্ষেত্রে আমরা পরস্পর-বিরোধী। বরং তোমাদের ছেলেদের মধ্যে আমরা আমাদের কালের অনেক চিন্তার টুকরো খুঁজে পাই।

আশ্চর্য্য!

তিনি পাইপ ধরালেন।

তারপর বললেন, তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। দুটো শতাব্দীকে

পৃথক ক'রে দেখতে তোমরা অভ্যস্ত নও। আমি বহুকাল পরে নেপাল থেকে ফিরে এলাম যেন রিপ ভ্যান উইংক্‌লের মতো। আমি বুঝতে পারছি, কি ছিল আর কি হয়েছে।

হালদারসাহেব এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন।

লিলি এসে ওঁর একটা আঙুল ধরে টেনে বললে, আসুন।

সরকারদম্পতি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন।

প্রশস্ত খাবার ঘরে বিলিতি কেতায় টেবিল সাজানো। হালদারসাহেব ফুল বড় ভালবাসেন লিলি জানে। ফুলদানিতে চমৎকার ক'রে সে ফুল সাজিয়েছে। খাবারের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ বিলিতি। মিসেস সরকার লিলির পরিশ্রান্ত অথচ পরিতৃপ্ত মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে বললেন, সকাল থেকে ওর আর বিশ্রাম নেই। এর মধ্যে কোন্‌গুলো তোমার রান্না ব'লে দেবে আমরা তার বিচার করব।

লিলি লজ্জিতভাবে হাসলে। বললে সে কি এখন বলি! যেগুলো তোমাদের ভাল লাগবে সেইগুলোকেই নিজের বলে চালাব।

হালদারসাহেব হো হো ক'রে হেসে বললেন, Good. কিন্তু আমরা যদি কোনোটার সম্বন্ধেই ভালো-মন্দ কোনো মন্তব্য না করি?

হাত নেড়ে লিলি বললে, তা'হলে তো বেঁচেই গেলাম। ভালো বলবার দরকার নেই, মন্দ না বললেই হ'ল। যা দিনকাল পড়েছে, কি বলুন?

ওর এই বিজ্ঞজনোচিত কথায় সকলেই হেসে উঠলেন।

হঠাৎ এক সময় হালদারসাহেবের হাত চলছে না দেখে মুখ তুলতেই লিলি দেখলে সমুখের একটা ছবিতে ওঁর দৃষ্টি যেন বিঁধে গেছে।

লিলি বললে, কি দেখছেন? খান!

হালদারসাহেব এক মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ খাই।

—ভালো হয় নি বুঝি?

—চমৎকার হয়েছে। ও ছবিটা কার?

—আমার ঠাকুমার।

—ও।

তখন আর কেউ কোনো কথা বললেন না। হালদার সাহেব তাড়াতাড়ি অন্যদিকে গল্পের মোড় ফেরালেন। কিন্তু বিকেলে ওঁরা যখন বনের দিকে বেড়াতে বার হলেন তখন লিলি প্রশ্নটা নতুন ক'রে তুললে।

বললে, আপনি আমার ঠাকুমার দিকে অবাক হয়ে কি দেখছিলেন বলুন তো?

হালদার সাহেব বললেন, ও হ্যাঁ। আমি ভারী আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম!

—কেন বলুন তো?

—আমি একটি মেয়েকে জানতাম, অবিকল তার মতন। দু'জন লোকের মধ্যে যে এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য থাকতে পারে তা আমি ভাবতেই পারি না।

কনক বললে, ছবিতে অমন লাগে। দু'জনের চেহারায় মোটামুটি মিল থাকলেই ছবিতে একরকম দেখায়।

সেকথার উত্তর না দিয়ে হালদারসাহেব বলতে লাগলেন, অনেক দিন আগের কথা। নেপালে দেখেছিলাম। তখন তার বয়স উনিশ-কুড়ি। আচ্ছা, তোমার ঠাকুমা কখনও নেপালে থাকতেন?

লিলি অন্যমনস্কভাবে বললে, থাকতে পারেন। তার পরে বলুন।

দাদু একটা সিগারেট ধরালেন।

বললেন, সেই মেয়েটি আমার জীবনে একটা ভূমিকম্পের মতো এসেছিল। আমার সমাজ, আমার সংসার, আমার গৃহ সমস্ত তছনছ ক'রে দিয়ে চ'লে গেল।

রুদ্ধ নিশ্বাসে লিলি বললে, মারা গেলেন?

—না। কিন্তু তারও চেয়ে বেশি। এ জীবনে আমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না।

—কেন?

—কারণ সে খৃষ্টান আর আমি হিন্দু। শুধু তাই নয়, আমি বিবাহিত এবং স্ত্রীবর্তমান।

লিলি নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগল।

একটু পরে হালদারসাহেব বললেন, পরে শুনেছিলাম, কোথায় যেন একটি ভালো ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গেছে।

হালদারসাহেব হাসলেন। বললেন, বিয়ের সময় নিমন্ত্রণ করে নিজের হাতে চিঠিও দিয়েছিল। বটতলার উপন্যাসের নায়িকার মতো লিখেছিল, নারী ও পুরুষের মধ্যে ওইটেই একমাত্র সম্পর্ক নয়। বাকী জীবনে আমাদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব যেন অক্ষুণ্ণ থাকে!

হালদারসাহেব অত্যন্ত ম্লানভাবে আর একবার হাসলেন।

কনক জিজ্ঞাসা করলে, ওঁকেই নিয়ে কি ঠাকুরমার সঙ্গে আপনার চির-বিচ্ছেদ ঘটেছিল?

—ওঁকেই নিয়ে। কিন্তু তোমার ঠাকুমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমাদের মেলামেশা, অন্তরঙ্গতা নিজের চোখে তিনি

দেখেছিলেন। তার পরে কোনো ভদ্রমহিলাই তাঁর স্বামীকে মার্জনা করতে পারেন না।

স্বামী-স্ত্রীর এই চিরবিচ্ছেদের মর্মান্তিক ইতিহাস ওরা দু'জনেই জানে। তাই কেউ কোনো কথা কইলে না।

একটু পরে হালদারসাহেব আবার বললেন, কিন্তু তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে, তোমাদের ঠাকুমা আমাকে ত্যাগ করেছিলেন, অন্য মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের জন্যে নয়, খৃষ্টান মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের জন্যে !

ওরা চুপ ক'রেই রইল।

হালদারসাহেব বললেন, ভালোবেসে এবং ভালো না বেসে জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি। জীবনে অনেক কিছুর পরে পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এই ক্ষত আমার আজও সম্পূর্ণ শুকোলো না। আমার বিয়ে হয়েছিল পোনেরো বছর বয়সে। দু'জনে খেলা করেছি, ঝগড়া করেছি, ভাব করেছি! কিন্তু ভালোবাসতে পারি নি। কলেজে পড়তে এসে দৃষ্টি গেল বদলে। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা নোলক-পরা মেয়েকে কিছুতে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারলাম না। এমন সময় এডিথ।

লিলি যেন চমকে উঠল : এডিথ ?

হালদারসাহেব তখন তন্ময়। লিলির ভাবপরিবর্তন তিনি লক্ষ্যই করলেন না। আপন মনেই ব'লে চললেন :

—এডিথ তার নাম। উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে। কলেজে পড়ে, চমৎকার ইংরিজি বলে, দিব্যি স্মার্ট্। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হ'ল আমার আত্মা যাকে কামনা করছিল এতদিন পরে তাকে পাওয়া গেল। তখন বুঝিনি সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে পাওয়া এত সহজ নয়। আত্মার আত্মীয়াও আমাদের নিজেদের তৈরী বিধানের ফলে পর হয়ে যায়।

হালদারসাহেব নিজের মনেই ঘাড় নাড়লেন।

লিলি জিজ্ঞাসা করলে, এডিথ কি সূত্রে নেপালে যেতেন?

—তাঁর এক কাকা ওখানে বড় চাকরী করিতেন। তাঁর ছেলেপুলে ছিল না। এডিথকে তিনি বড় ভালোবাসতেন। বছরে গ্রীষ্মের তিনটে মাস এডিথ ওখানেই থাকত।

কেউ কোনো কথা বললে না। একটি ঝাঁক টিয়াপাখী ওদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। তারপরে চারিদিক আবার নিস্তব্ধ। কাছের নদীর জলে ওদের দীর্ঘ ছায়া নিঃশব্দে দোল খেতে লাগল।

লিলি হঠাৎ প্রশ্ন করলে, আচ্ছা দাদুভাই, আপনি তাঁকে কি সত্যই ভালোবেসেছিলেন? না, তাঁর স্মার্টনেস্, তাঁর ইংরিজি বলা আপনাকে মুগ্ধ করেছিল?

হালদারসাহেব আস্তে আস্তে বললেন, সত্যিই ভালোবেসেছিলাম। জীবনে সেই প্রথমবার এবং শেষবার।

কনক বললে, আচ্ছা, এখন যদি হঠাৎ তিনি এসে বলেন, আমায় খুঁজছিলে? এই আমি ফিরে এলাম। তাহ'লে?

হালদারসাহেব অসহায়ভাবে চারিদিকে চেয়ে কি যেন একটা উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে বললেন, তাহ'লে? কি জানি, এতকাল পরে হয়তো তাকে চিনতেই পারব না।

ওরা দু'জনেই এই উত্তরে হেসে উঠল।

তারপর বললে, চলুন, ওঠা যাক। সন্ধ্যে হয়ে আসে।

হালদারসাহেব তাঁর গুরুভার স্থবির দেহ কষ্টের সঙ্গে তুলতে তুলতে বললেন, চল।

হালদারসাহেবের সকালে উঠার অভ্যাস নেই। আটটায় তাঁর ঘুম ভাঙে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেই সময়েই এক পেয়ালা চা খান। তারপর আরও একটু গা গড়িয়ে বিছানা ছাড়েন। তাঁর ছোট হাজরীর সময় সাড়ে ন'টা।

সাড়ে ন'টাতেই তিনি ছোট হাজরী খাচ্ছিলেন। পাশের একটা চেয়ারে রামেন্দু তাঁকে সেদিনের খবরের কাগজ থেকে একটা অংশ প'ড়ে শোনাচ্ছিল। এ পাশে কনক টেবিলে হাতের ভর দিয়ে বিস্ফারিত চোখে সেই কৌতূহলজনক সংবাদ যেন গিল্‌ছিল।

এমন সময় শৈলবিহারী এলেন। এবং এই গৃহের অশুচিতার সর্ব-প্রকার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দোর গোড়াতেই আলগোছে দাঁড়ালেন। তাঁর পরণে তখনও পট্টবস্ত্র এবং শিখায় একটি ছোট ফুল বাঁধা রয়েছে। বোধ হয় এই মাত্র পুজা সেরে উঠে এলেন। নাসিকা এবং ললাটে তিলকের রেখা এতটুকু মলিন হয় নি। চোখ-মুখ পূজাকালীন গভীর প্রশান্তিতে স্নিগ্ধ।

হালদারসাহেব অখাদ্য কিছুই খাচ্ছিলেন না। দুই একটা মিষ্টি এবং এক বাটি চা। কিন্তু বাপের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রামেন্দু এবং কনক খাবার টেবিলের ঘনিষ্ঠতা থেকে যেন ছিটকে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। বাপের উপর জোর নেই, কিন্তু ছেলেমেয়েদের মনে সেই অনাচারের ছোঁয়াচ যাতে না লাগে সেদিকে শৈলবিহারীর খরদৃষ্টি।

অজ্ঞাতসারেই তাঁর মুখের উপর যেন একটা পাতলা কালো ছায়া নামল। কিন্তু যথাসাধ্য সংযতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার শরীর এখানে ভালো লাগছে তো?

শৈলবিহারীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘ'টে গেল সেদিকে হালদারসাহেবের দৃষ্টিই পড়ল না।

তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, চমৎকার লাগছে! খুব ভালো লাগছে! এত ভালো আমার কোথাও লাগে নি। বিশেষ ক'রে এই এদের নিয়ে....

এতক্ষণে তাঁর দৃষ্টি পড়ল রামেন্দু এবং কনক দু'জনেই তাঁর সন্নিকট থেকে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বললেন, তোরা ওখানে গিয়ে দাঁড়ালি কেন?

কিন্তু সেদিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আবার শৈলবিহারীকে লক্ষ্য ক'রে বলতে লাগলেন, এ জায়গাটা বেশ খটখটে। দার্জিলিঙে থাকতে যে বাতের লক্ষণটা দেখা দিয়েছিল, এখানে এসে সেটা গেছে। বেড়ানোও হচ্ছে খুব। মোটের উপর...না হে, জায়গাটা বেশ ভালো বুঝলে?

স্থানটার প্রশংসা এবং পিতার স্বাস্থ্যোন্নতির সংবাদেও শৈলবিহারীর মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল ব'লে মনে হ'ল না। বরং তিনি যেন হতাশই হয়ে গেলেন।

হালদারসাহেব আসার পর থেকেই শৈলবিহারী কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছেন। হালদারসাহেবের আচারে-আচরণে, বেশভূষায়, কথায়বার্তায় এমন একটা উৎকট বিজাতীয়তা আছে যা তিনি যথেষ্ট পিতৃভক্তি সত্ত্বেও কিছুতে সহ্য করতে পারেন না। হালদারসাহেব যদি এখানে না থেকে অন্য কোথাও যান, তার জন্যে শৈলবিহারী তাঁর সকল প্রকার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত আছেন। ভয় তাঁর ছেলে-মেয়ের জন্যে। আজ যে অবস্থা তিনি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করলেন, কে জানে, হালদারসাহেবের কল্যাণে ওদের কোমল চিত্তে যে অনাচার

প্রবেশ করেছে এ তার একটা সামান্য ভগ্নাংশ কি না। তা যদি হয়, তাহ'লে যথেষ্ট পিতৃভক্তি সত্বেও তাঁকে এখন থেকেই সতর্ক হ'তে হয়েছে।

কিন্তু অনাচার এত প্রশ্রয় পেয়েছে সুরুচির জন্যে। এতকাল যে অভ্যাসের মধ্যে হালদারসাহেব কাটিয়েছেন, সুরুচি যেন পণ করেছে তার এতটুকু ত্রুটি ঘটতে দেবে না।

শুষ্ক কণ্ঠে শৈলবিহারী বললেন, ভালো থাকলেই ভালো। তবু যদি অন্য কোথাও চেঞ্জে যাবার দরকার মনে করেন তাহ'লে বলবেন।

চামচে ক'রে এক টুকরো সন্দেশ মুখের মধ্যে দিয়ে হাত দুটো ঘষতে ঘষতে হালদারসাহেব বললেন, কিছুমাত্র দরকার হবে না। অন্তত এরা যতদিন আছে ততদিন তো নয়ই।

ব'লে দু'হাত বাড়িয়ে এঁটো হাতেই ওদের দু'জনকে বুকের কাছে টেনে নিলেন।

শৈলবিহারী এত বড় অনাচারের দৃশ্য আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারলেন না। বিরক্ত মুখে বেরিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে রামেন্দু আর কনক যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

রামেন্দু তড়াক ক'রে তার পূর্বতন আসনে বসে আগে তো একটা গভীর নিশ্বাস ছাড়লে।

তারপর বললে বাবাঃ! বাঁচলাম। বাবাকে দেখলেই আমার শরীরের গাঁটগুলো যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়।

কনকও হেসে বললে, যা বলেছ!

তারপর দাদুর গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, বাবাকে দেখলে মনেই হয় না, বাবা আপনার ছেলে। সত্যি।

হালদারসাহেব হো হো ক'রে হেসে বললে, বলিস কি রে!

রামেন্দুও বললে, সত্যি দাদু।

গম্ভীর হয়ে হালদারসাহেব বললেন, তাই হয়। সরকারী চাকুরের ছেলে স্বদেশী হয়, আর স্বদেশীর ছেলে সরকারী চাকরী নেয়। দাতার ছেলে কৃপণ হয়, কৃপণের ছেলে দাতা হয়। পণ্ডিতের ছেলে মূর্খ হয় আর মূর্খের ছেলে পণ্ডিত হয়। দেখিস নি?

—কেন হয়?

—কি জানি। কি করে যেন ছেলের মনে বাপের ব্যবহারের একটা প্রতিক্রিয়া হয়। আমার অনাচারের প্রতিক্রিয়া হ'ল তোর বাপের অতি-নিষ্ঠা।

কনক তাড়াতাড়ি বললে, আপনার অনাচার বলবেন না দাদু। অনাচারী আপনি নন।

হালদারসাহেব হেসে বললেন, অনাচারীই তো। বরং কদাচারী নই। কিন্তু কি জানিস, ওটা ছিল আমাদের কালের ধর্ম।

—কি রকম?

—হ্যাঁ, তাই। আমাদের কালে হিন্দু ধর্মের অন্ধ সংস্কারকে আঘাত করবার একটা নেশা যেন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে পেয়ে বসেছিল। হিন্দু ধর্মে যেগুলো বিশেষ নিন্দনীয়, সেইগুলো আমরা প্রকাশ্যে করতাম এবং গর্বের সঙ্গে করতাম। জাতির বিচার, খাবার বিচার, আচারের বিচার আমরা গায়ের জোরে ভাঙতে চেষ্টা করেছি। সেকালে শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের ওইখানেই ছিল পার্থক্য।

—তারপরে?

—তারপরে এল শৈলবিহারীর দল। ওরা আবার নতুন ক'রে রাখলে টিকি, গায়ে দিলে নামাবলী। পূজায়-অর্চনায়, খাওয়া-ছোঁয়ার

আচারে-বিচারে ওরা একেবারে রঘুনন্দনের কালকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলে। একেবারে উলটো।

—ফলে কি হ'ল?

—কিছুই হ'ল না। আমরাও জিতলাম না, ওরাও ঠকল।

—তা কেন হ'ল?

—তাই তো হবে। আমরা অসময়ে কুঁড়িতে ঘা মেরে ফুল ফোটাতে চেয়েছিলাম। তা কখনও হয়? ফলে কুঁড়ি যত ছিঁড়েছে, ফুল তত ফোটে নি।

—আর ওঁরা।

দাদু এইবার হেসে উঠলেন।

বললেন, ওরা আমাদের চেয়েও বোকা। ওরা নদীর স্রোত উজানে ফেরাতে চাইলে, যেটা একেবারে অসম্ভব। যে কাল গেছে, সে কাল কি আর ফেরে? না ফেরা উচিত?

ওরা নিঃশব্দে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল।

হালদারসাহেব বললেন, তবু একটা সান্ত্বনা আমাদের আছে। তোদের সঙ্গে ওদের চেয়ে আমাদের মিল বেশি। অন্তত আমাদের দেখে তোদের শরীরের গাঁট আড়ষ্ট হয়ে যায় না।

ওরা হাসলে।

—একটা কথা কি জানিস, আমাদের কালে আমরা দুর্গপ্রাচীর ভেঙ্গে সমাজকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলাম। লোকে দৈত্য ভেবে আমাদের দিকে সভয়ে চেয়েছে, প্রাণপণে আমাদের সংশ্রব এড়িয়ে গিয়েছে। ভেবেছে, আমরা ওদের কেউ নই, আমরা সমাজদ্রোহী শত্রু। স্ত্রীতে পর্যন্ত স্বামীকে স্পর্শ করতে ঘৃণা করেছে।

হালদারসাহেব চুপ করলেন।

শেষের অভিযোগটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত। ঠাকুমাকে ওরা দেখেছে। ঘটনারও অনেকখানি জানে। সেই লজ্জাকর স্মৃতি দূর করবার জন্যে ওরা তাড়াতাড়ি বললে, আর আমাদের কালে?

—তোমাদের কালে? দুর্গ-দুয়ার অত্যন্ত সহজে আপনি গেল খুলে। অজ্ঞাতসারে মানুষ খোলা হাওয়ায় বাইরে এসে দাঁড়াল। এখন রামেন্দুর পক্ষে স্বচ্ছন্দে লিলি সরকারের সঙ্গে প্রেম করা চলে। হয়তো একদিন দস্তুরমাফিক বিবাহও হয়ে যাবে।

কনক মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে পালাল।

রামেন্দু বললে, যান! আপনাদের কালের লোকগুলো যেন কী! কোনো কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে!

হালদারসাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

বললেন, Exactly. তোরাও যা করছিস, আমরাও তাই ক'রেছি। কেবল কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে যত গালাগালি খেয়েছি আর অশান্তি কুড়িয়েছি। চল্, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। সে গেল কোথায়? কনক?

কনক ও-ঘর থেকে হাসি চেপে কোনো রকমে সাড়া দিলে, যাই দাদু।

—আর দেরি করিসনে দিদি।

—না, দেরি কিসের? চলুন।

কনক ওঁকে নিয়ে বেড়াতে বেরুল।

হালদারসাহেব যখন গেটের গোড়ায় এসেছেন তখন অধ্যাপক নরেশ বড়ুয়া তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন।

কনকের কাঁধের উপর হালদারসাহেবের একখানা হাত। তার

স'রে যাবার উপায় নেই। বড়ুয়াকে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে সে দাদুর আরও গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

হালদারসাহেব প্রতিনমস্কার করে বললেন, শৈলকে বুঝি? সে বোধ হয় পড়ার ঘরে আছে।

বড়ুয়া হেসে বললেন, আপনার কাছেই আসছিলাম। ছেলেদের কাছে প্রায়ই আপনার কথা শুনি। রোজই ভাবি আপনার কাছে আসব। কিন্তু আসা আর হয়ে ওঠে না। বেরুচ্ছেন বুঝি?

—একটু বেরুচ্ছিলাম। তা হোক, এস তুমি। কনক, এই দিকের বারান্দাতেই দু'খানা চেয়ার বের ক'রে দে না।

কনক চেয়ার বের ক'রে দিলে।

হালদারসাহেব বললেন, আমারই একদিন যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, কি জান, এই ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়েই দিন আমার এমন চমৎকার কেটে যায় যে,....তা'ছাড়া....

হালদারসাহেব হো হো ক'রে হেসে বললেন, থাক্। সে আর না বলাই ভালো।

বড়ুয়াও হাসলেন। বললেন, কি ব্যাপার?

হালদারসাহেব হেসে বললেন, ব্যাপার কিছুই নয়। তোমরা হ'লে পণ্ডিত মানুষ। আমার কেমন ভয়ই করে।

বড়ুয়া লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। বললেন, কি যে বলেন! আপনার কাছে আমরা....প্রোফেসার সরকারের কাছে আমরা সবই শুনেছি। আপনার পাণ্ডিত্য....

হালদারসাহেব হো হো ক'রে হেসে বললেন, থাম, থাম। আমার পাণ্ডিত্য! Good. আমার পাণ্ডিত্যের কথা এই এদের জিজ্ঞেস কর। আমার পাণ্ডিত্য ওদের চেয়ে বেশি নয়।

বড়ুয়া অবিশ্বাসের সঙ্গে হাসলেন।

হালদারসাহেব বললেন, এদেরই সঙ্গে হেসে খেলে গল্প ক'রে দিন মন্দ কাটছে না। এখন সেই বাতের বেদনাটা আর না উঠলে বাঁচি।

—আপনিও কি বাতে ভুগছেন নাকি?

—বিলক্ষণ! আজ দশ বৎসর ধ'রে। মধ্যে তো পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম। এখানকার শুকনো আবহাওয়ার যেন একটু সুস্থ বোধ করছি।

বড়ুয়া গম্ভীরভাবে বললেন, বাতের যন্ত্রণা বড় ভীষণ যন্ত্রণা। আমার এক পিসিমাকে নিয়ে কী কষ্টে যে দিন কেটেছে!

বড়ুয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, চিকিৎসা কি করাচ্ছেন?

—আর চিকিৎসা করাই না। ওষুধ, মালিশ, ইনজেকশান, বাকি কিছুই রাখি নি। অবশেষে দেখলাম, মিথ্যে কতকগুলো টাকা খরচ। কারণ যন্ত্রণা যখন আরম্ভ হয় তখন কিছুতেই কিছু হয় না। যখন যন্ত্রণা থাকে না তখন কিছুরই দরকারও হয় না।

হালদারসাহেব হো হো ক'রে হাসলেন।

বড়ুয়ার মধ্যে হাস্যরসের অত্যন্ত অভাব। হালদারসাহেবের হাসি দেখে তিনি হাসলেন না।

গম্ভীরভাবে বললেন, আপনি এক কাজ করুন।

—কি কাজ?

—আপনি বিল্বেশ্বরে যান।

—সে কোথায়?

—ঠিক জানি না। বোধ হয় নদীয়ায়, কিংবা বীরভূমে। আমি জেনে ব'লে দিতে পারি।

—তারপরে ?

—বাবা বিল্বেশ্বরের কাছে ধর্ণা দিন, বাতের বেদনা সেরে যাবে। আমার পিসিমার তাইতে সেরেছে। আপনাকে বলি শুনুন :

বড়ুয়া চোখ পাকিয়ে খুব উত্তেজিত ভাবে বলতে লাগলেন :

—রেল স্টেশন থেকে দশ-বারো মাইল পথ। গরুর গাড়িতে যেতে হয়। কিন্তু ওই একবার। এমনি বাবার মাহাত্ম্য, উত্থানশক্তিরহিত বেতো রুগী একদিনের ওষুধে এমন সুস্থ হয়ে যায় যে, আসবার সময় হে'টেই ফিরে আসে।

—ওষুধটা কি ?

—কিচ্ছু না। বাবার মন্দিরের সামনে একটা ছোট পুকুর আছে। তার জল দেখলে আপনার ভক্তি হবে না। বেলপাতায়, দুধে আর বহুলোকের স্নানে জল সকল সময়ই কাদা-গোলা। সেইখানে স্নান ক'রে ভিজে গায়ে, ভিজে কাপড়ে নাটমন্দিরে প'ড়ে থাকতে হবে। তারপরে কেউ প্রত্যাদেশ পায়, কেউ পায় না, কিন্তু ভালো সবারই হয়।

—কত পয়সা খরচ হয় ?

—সওয়া পাঁচ আনা। তবে একটা তেল আছে, সেইটের বোধ হয় কিছু দাম নেয়।

হালদার চুপ করে রইলেন।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তোমরা তো বৌদ্ধ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমরা এ সব বিশ্বাস কর ?

—আজ্ঞে চোখে দেখা যে! বিশ্বাস না ক'রে উপায় কি ? আপনার কি এ সব বিশ্বাস হয় না ?

—না।

—কিন্তু আমার পিসিমাকে চোখে দেখলে…

—দেখলেও বিশ্বাস করতাম না। হয়তো ওখানকার মাটি-জলের একটা বিশেষ গুণ আছে, যা বাতের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু….

সোৎসাহে বড়ুয়া বললেন, তাহ'লেই হ'ল। ওই ময়লা পুকুরে স্নান করলে, ওখানকার মাটি মাখলে বাত সারে। এটা প্রত্যক্ষ সত্য। তাহ'লেই তো হ'ল।

হালদারসাহেব ঈষৎ হাসলেন।

বললেন, তাহ'লেই হল না। যতদিন বাবা বিশ্বেশ্বরের নাম ক'রে লোক ঠকানো চলবে ততদিন বাতে ম'রে গেলেও ওখানে কারও যাওয়া উচিৎ নয়। তাতে প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

—কিন্তু সেটাও তো প্রবঞ্চনা নয়। বাবা বিশ্বেশ্বরেরও মাহাত্ম্য আছে যে। নইলে ওই গ্রামেই আরও একশোটা পুকুর আছে, সেখানে স্নান করলে ভালো হয় না কেন?

মাথা নেড়ে হালদারসাহেব বললেন, সত্যিসত্যিই ভালো হয় কি না, হ'লে কিসে ভালো হয় সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু এই ব্যাপারে বাবা বিশ্বেশ্বরকে টেনে এনে যে একটা বুজরুকি আর ব্যবসা চালান হচ্ছে তাতে আর ভুল নেই। সেইখানেই আমার আপত্তি।

বড়ুয়া বিস্মিতভাবে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, আপত্তিটা কিসের? আপনি কি দেবমাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন না?

—না।

—তাহ'লে বোধ হয় ভগবানেও বিশ্বাস করেন না?

—না।

—তাহ'লে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

বড়ুয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু তবু যেন হাল ছাড়লেন না। বললেন, দেখুন আপনার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এ বয়সে ভগবান, পরকাল, পুনর্জন্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন স্বভাবতই মানুষের মনে আসে। আপনার কি সে রকম কোনো প্রশ্নই মনে আসে না?

—কদাচিৎ। তোমাদের মত বিজ্ঞ লোকের সংস্পর্শে এলে মাঝে মাঝে মনে আসে,—ভগবানের কথা, পরকালের কথা, বাতের কথা, অজীর্ণের কথা। নইলে আসে না।

—আপনি কি যুক্তি দিয়ে নিঃসংশয়ে বুঝেছেন যে, ভগবান নেই?

—ভগবান আছেন বোঝবার জন্যেই যুক্তির দরকার, ভগবান নেই বোঝবার জন্যে নয়। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাদের ভগবান সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহলও নেই।

কথাটা শুনে বড়ুয়ার মুখ প্রসন্ন হ'ল না।

ওঁর অপ্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে স্মিতমুখে হালদারসাহেব বললেন, তার জন্যে তুমি দুঃখ কোরো না বাবা। ভগবান যদি সত্যিই থাকেন, আমার স্বীকার-অস্বীকারে তাঁর কিছুই এসে-যাবে না। আমি অস্বীকার করার পরেও তিনি যথারীতি বিরাজ করতে থাকবেন।

বড়ুয়া এবারে হেসে উঠলেন। বললেন, সে তো নিশ্চয়ই। তবে····

—এর মধ্যে তবে নেই বাবা। তাছাড়া কি জান, আমার মনে হয় নিজেদের পরিত্রাণের জন্যে এখন কিছুকাল আমাদের নাস্তিক হওয়ার দরকার পড়েছে।

—সে কি রকম?

—সে কি রকম জানো ? ভগবান আছেন,—স্বীকার ক'রে নিলাম আছেন। কিন্তু কি রকম আছেন জানো ? যেমন ক'রে একান্নবর্তী পরিবারের বুড়ী মা থাকেন। তিনি মরতে পারেন নি তাই আছেন। বাড়ির লোকেরা তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। কিন্তু ওই পর্যন্ত। সেই স্বীকৃতির সঙ্গে তাদের মনের যোগ নেই, শুধু মুখের যোগ আছে।

—কিন্তু নাস্তিক হয়ে লাভ কি হবে ?

—লাভ কি হবে ভারতের ধর্মবিপ্লবের ইতিহাস খুললেই দেখতে পাবে। যুগে যুগে ধর্ম যখনই শুকনো আচার-বিচারের মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে এসেছে তখনই একটা মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে,—হয় নাস্তিক্য-বাদ, নয় শূন্যবাদ, নয় কিছু। তার ফলে জাতির বদ্ধ মনে আবার নতুন ক'রে স্রোত খেলেছে, আবার এসেছে নতুন চেতনা। নাস্তিক্যবাদকে যদি তুমি পছন্দ নাও করতে পার, তার প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই পছন্দ করবে।

প্রত্যুত্তরে বড়ুয়া কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে হালদার-সাহেব বললেন, এরও প্রতিবাদে বলবার আছে আমি জানি। কিন্তু এ কথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, মেকানিকাল আস্তিক্যবাদের চেয়ে আন্তরিক নাস্তিক্যবাদও ভালো।

এ বিষয়েও বড়ুয়ার অন্তরের সায় ছিল না। কিন্তু সে কথা জানাবার সুযোগও তিনি পেলেন না।

হালদারসাহেব তাড়াতাড়ি বললেন, ভালো কথা। তোমার দাঁতের বেদনাটা সেরেছে ?

—আর দাঁত ! সেটা সেরেছে, কিন্তু তার পাশেরটা নড়ছে। কষ্ট দেবে মনে হচ্ছে।

দাঁতের বেদনা সম্বন্ধে বড়ুয়ার একটা আন্তরিক উৎসাহ আছে। তিনি পরমাগ্রহে সেই ইতিহাস আনুপূর্বিক বিবৃত করতে লাগলেন। হালদারসাহেব পাশের খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন, আর মাঝে মাঝে সায় দিতে লাগলেন।

বিকেল বেলায় লিলি এল।

বললে, দাদু কি ডুমুরের ফুল হয়েছেন না কি ?

—কি রকম ?

—আর দেখাই পাওয়া যায় না।

হালদারসাহেব দু'হাত আকাশে তুলে অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন।

বললেন, Good. ডুমুরের ফুল ? উঁ ? কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। অনেক দিন পরে শুনলাম। চমৎকার লাগল ! বাঃ !

কনক বললে, হয়েছে ! এইবার দাদু ওই নিয়েই লাফাতে থাকবেন। কি এমন আশ্চর্য কথা শুনলেন বলুন তো ?

—সে তোরা বুঝবি না, তোরা বুঝবি না। শাস্ত্রে বলে, শব্দ ব্রহ্ম। আমি ব্রহ্ম মানি না। কিন্তু শব্দের মধ্যে আনন্দ আছে। এক একটি শব্দ বিশেষ একটি সময়ে যেন···

বাধা দিয়ে লিলি বললে, চুলোয় যাক শব্দ ব্রহ্ম। সকালে কি করছিলেন তাই বলুন।

—সকালে ? কি করছিলাম রে ?

ব'লে হালদারসাহেব কনকের দিকে চাইলেন।

কনক বললে, বড়ুয়া এলেন।

—ও হ্যাঁ। বড়ুয়া এলেন। তাঁর সঙ্গে বাতের গল্প করছিলাম।

—বাতের গল্প ? সে আবার কি ?

লিলি খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

হালদারসাহেবও হাসলেন। বললেন, সে অনেক গল্প। বড়ুয়ার পিসিমারও বাত হয়েছিল। তারপরে কোথাকার শিবের মাদুলী নিয়ে সেরে যায়। সেই সব অলৌকিক গল্প। বেশ লাগছিল, না রে কনক ?

ঠোঁট উলটে কনক বললে, ছাই !

—ছাই কি-রে ? সেই ময়লা জলের পুকুর, সেখানকার আশ্চর্য মাটি, শিবের দোরে ধর্ণা দেওয়া....জায়গাটার কি নাম বললে ?

—জানি না—যান।

হাই তুলে হালদারসাহেব বললেন, ওই তো তোদের দোষ ! ঠাকুর-দেবতার কথায় মন বসে না। খালি প্রেম, আর প্রেম।

—বেশ করি। আপনি থাকুন ঠাকুর-দেবতা নিয়ে। আমরা পারব না। আমাদের দায় পড়েছে।

হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে অভিনয়ের ভঙ্গিতে হালদারসাহেব বললেন, এই পাপেই আর্যাবর্ত রসাতলে গেল।

হালদারসাহেবের গা ঘেঁষে ব'সে লিলি বললে, যাক। ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন।

—তাহ'লে কাজের কথাটা কি শুনি ? প্রেমের কবিতা পড়া ?

—নিশ্চয়ই।

হালদারসাহেব হেসে বললেন, একেই বলে সঙ্গ দোষে শতগুণ নাশে। বড়ুয়ার কাছে বসলেই বাতের গল্প মনে আসে, কত ঠাকুর-দেবতার কথা হয়। আর তোদের কাছে বসলেই....

—যত প্রেমের গল্প, না দাদু ?

—নয় ?

—হুঁ। কিন্তু আমি কি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্যে এসেছি?

—তবে কি জন্যে এসেছ দিদি?

—গল্প শুনতে।

—ওরে বাবা!

লিলি বললে, হ্যাঁ। আমি ঠিক ক'রে এসেছি আপনাদের আমলের প্রেমের গল্প শুনব।

—আমাদের আমলের? এ আবার কি উদ্ভট সখ!

উদ্ভট আবার কি? আপনাদের আমলে কি প্রেম ছিল না?—কনক বললে।

—থাকবে না কেন, ছিল। তোদের মতন ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রেমও ছিল। কিন্তু সেটা নিতান্তই ইংরিজি-ওয়ালাদের মধ্যে।

—আর বাকি?

—বাকি? আসুরিক প্রেম।

—রক্ষে করুন! সে আবার কি?

হালদারসাহেব ভাল ক'রে ব'সে বললেন, সেটাই সংসারের আদি-কালের প্রেম। বড় ভাল জিনিস! একেবারে খাঁটি, তার মধ্যে আর খাদ নেই। শুনবি?

—শুনে রাখি।

—শোন্ তাহ'লে। সেকালে এইটেই আমরা হামেশা দেখতে পেতাম।

হালদারসাহেব বলতে লাগলেন:

—স্বামী ফিরে এলেন রাত দু'টোর সময়। এসে দেখলেন, স্ত্রী অঘোর নিদ্রায় অচেতন। সঙ্গে সঙ্গে প্রেম পঞ্চমে উঠল। চুলের মুঠি ধ'রে একটা ঝাঁকি দিয়ে স্ত্রীকে তুলে চোখ পাকিয়ে স্বামী বললে, দুটো পর্যন্ত তাস খেলে-খেলে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল, আর এটা এইখানে

শুয়ে ঘুমুচ্ছে? অপ্রস্তুত হয়ে ধড়মড় ক’রে উঠে স্ত্রী বললে, মর্ মুখপোড়া! জাগানোর রকম দেখ না!

কনক আর লিলির চোখ কপালে উঠল। নিশ্বাস বন্ধ ক’রে বললে, তারপরে?

—তারপরে, ঘরের কোণে খাবার ঢাকা ছিল। হাসতে হাসতে স্ত্রী গিয়ে ভাত বেড়ে দিলে। গব্ গব্ ক’রে স্বামী সেগুলো গোগ্রাসে গিলে মুখ-হাত ধুয়ে পান চিবুতে লাগল। স্ত্রী তামাক সেজে গড়গড়ার নলটি মুখে তুলে দিয়ে স্বামীর পাতে খেতে বসল। খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসন মেজে স্ত্রী যখন ফিরে এল তখন স্বামীর নাক ডাকছে। একটা ধাক্কা দিলে তবু সাড়া পাওয়া গেল না। মিন্সের ঘুম দেখ, ব’লে মুচ্‌কি হেসে স্ত্রী মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

হাসতে হাসতে কনক আর লিলি গড়িয়ে পড়ল।

বললে, সর্বনাশ! এই বুঝি আপনাদের কালের প্রেম?

এই আমাদের কালের প্রেম। এই সমস্ত কালের প্রেম। এই আদি ও অকৃত্রিম প্রেম,—অব্যর্থ ফলপ্রদ।

দু’জনেই মাথা হেলিয়ে বললে, ভালো।

[৫]

আঠারো ও আশী বছরের ব্যবধান দেখতে দেখতে দূর হয়ে গেল। হালদারসাহেবের সঙ্গে কনক ও লিলির সম্পর্ক অনেকটা সমবয়সী বন্ধুর মতো হয়ে গেল। দিনের অধিকাংশ সময় ওদের হালদারসাহেবের সংসর্গেই কাটে। সমস্ত দিন ধ’রে ওদের হাসি, গল্প, গানের আর বিরাম নেই।

এর পিছনে আছেন সুরুচি। এই বৃদ্ধ শিশুটির উপর সত্য সত্যই তাঁর কেমন মমতা পড়ে গেছে। সংসারে ছোট শিশু এলে মায়ের যেমন কাজ বেড়ে যায়, তাঁরও তেমনি কাজ বেড়ে গেছে। আগে ঠাকুর রেঁধেছে, কখনও তিনি সামনে থেকে দেখিয়ে দিয়েছেন, কখনও দেন নি। এখন হালদারসাহেবের খাবার তিনি ঠাকুরের হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা পান না। কি জানি হয়তো তাঁর খাওয়াই হবে না।

তা'ছাড়া হালদারসাহেবের খাদ্য এ বাড়ির সাধারণ খাদ্য থেকে স্বতন্ত্র। এ বাড়িতে আগে মাংস ঢুকতই না। সেইজন্যে তাঁর জন্যে সুরুচিকে আর একটা পৃথক হেঁসেলই করতে হয়েছে। তাঁর রান্না সুরুচি নিজের হাতে রাঁধেন, নিজের হাতে পরিবেষণ করেন এবং নিজে সামনে থেকে খাওয়ান।

কিন্তু শুধু সেই জোরে যে হালদারসাহেবকে বেঁধে রাখা যাবে, সে সাহসও সুরুচির নেই। তার চেয়ে বরং তিনি মেয়েদের উপরই ভরসা করেন বেশি। হালদারসাহেবের সঙ্গে ওদের অন্তরঙ্গতায় তিনি খুশি হন এবং মাঝে মাঝে মনে মনে এই ভেবে হাসেন যে, এত দিন পালিয়ে পালিয়ে এইবার তিনি শক্তের পাল্লায় পড়েছেন! এ বাঁধন কেটে যান তো দেখি!

সেদিন সকালে ওরা দু'জন যখন হালদারসাহেবের কাছে এল, তিনি তখন একলা ব'সে আপন মনে খবরের কাগজ উল্টাচ্ছিলেন।

লিলি হাসতে হাসতেই বললে, এলাম দাদু, বিরক্ত করতে।

—আয়।

—খবরের কাগজ পড়া হয়ে গেল?—কনক জিজ্ঞাসা করলে।

—না। শোনা দেখি প'ড়ে প'ড়ে?

কনক খিল খিল ক'রে হেসে বললে, চমৎকার! তবে এই এক ঘণ্টা ধ'রে করছিলেন কি?

—কিচ্ছু না। শুধু উল্‌টে যাচ্ছিলাম।

—তার মানে?

হালদারসাহেব বাঁ হাতে খবরের কাগজটা সরিয়ে ডান হাতে চশমা খুলে স্মিতনেত্রে ওদের দিকে চাইলেন।

বললেন, সে বুঝি এখনও টের পাস নি? আমার দুটো নেশা আছে। একটা, ক্রমাগত খবরের কাগজের পাতার পর পাতা উল্‌টে যাওয়া। পড়ি না, শুধু ওলটাতে-ওলটাতে যা চোখে পড়ে তাই দিয়ে পৃথিবীর চমৎকার একটা রূপ আমার চোখে ফুটে ওঠে। জাপানে ভীষণ ভূমিকম্প, মুসোলিনীর হুংকার, ফ্রান্সে ট্রেন-দুর্ঘটনা, আমেরিকায় শ্রমিক ধর্মঘট, ঢাকায় বিবাহিতা তরুণী হরণ···শুধু হেডিং দেখেই আমি পৃথিবীর একটা মোটামুটি আন্দাজ পেলাম। বেশ লাগে!

—এই তো গেল একটা। দ্বিতীয়টা?

—দ্বিতীয়টা পঞ্জিকা।

বিস্মিতভাবে ওরা দু'জনে এক সঙ্গে বললে, পঞ্জিকা! আপনি পঞ্জিকা পড়েন না-কি?

—নিয়মিতভাবে। কিন্তু ওই দিনক্ষণগুলো নয়।

তবে?

—বিজ্ঞাপন। বিশেষ ক'রে বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো। একজন বলশালী পুরুষ হাতে ক'রে একটা আস্ত গাছের গুঁড়ি চিরে দু'ভাগ ক'রে ফেললে। আর একজন বাঁ হাতে একটা সিংহ এবং ডান হাত দিয়ে একটা হাতী শূন্যে তুলে ফেলেছে। কোথাও স্বয়ং মহাদেব এসে জরাজীর্ণ রোগীকে ওষুধ দিচ্ছেন। কোথাও বা একটা অর্ধ-উলঙ্গ অপ্সরা

আকাশ-পথে উড়ে যেতে যেতে বটিকা বিতরণ করছে। তুমি গোটা বাঙলাদেশের একটা বড় অংশকে ওই বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেখতে পাবে।

ওরা হেসে উঠল।

বললে, আপনি একটি পাগল দাদুভাই।

হালদারসাহেবও হাসলেন। বললেন, পাগল নয় রে বোকা মেয়ে, একদিন নিরিবিলি পড়ে দেখিস। দেখবি, কত সন্ন্যাসিদত্ত মাদুলী, ফকিরদত্ত তাবিজ, ঋষিদত্ত ওষুধ আর স্বপ্নদত্ত বটিকা এই একটা জাতকে নাগপাশে বেঁধে রেখেছে!

কনক বললে, ক্ষতি কি?

—ক্ষতি নেই? তোরা এ সব বিশ্বাস করিস নাকি?

—আমরা ওসব বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না। ওসব আমরা ভাবিই না।

—তার মানে? এতে যে জাতির কত বড় ক্ষতি হচ্ছে সে তোরা স্বীকার করিস না?

—করতে পারি। কিন্তু আপনাদের মতো অতটা নিঃসংশয় নই। আপনাদের মতো এ বিশ্বাসও করি না যে, ওগুলো থাকতে আমাদের মুক্তি নেই। আমরা ধ'রে নিয়েছি আরও পাঁচটা বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত জিনিসের সঙ্গে ওগুলোও থাকবে। ওর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

হালদারসাহেব মনোযোগের সঙ্গে কনকের কথা শুনলেন। বললেন, সত্যি।

তারপর হেসে বললেন, তোদের কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হয়। মনে হয়, আমাদের কালে প্রচলিত কুসংস্কার, সামাজিক কুপ্রথা প্রভৃতি যে সবের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম, তার কিছুই ব্যর্থ হয় নি।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে মনে হয়, সেই সব সংস্কার এবং প্রথা এখনও টেঁকে তো আছে। টেঁকে আছে সত্যি, কিন্তু বেঁচে যে নেই তা তোদের দিকে চাইলেই বোঝা যায়।

হালদারসাহেব অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন।

লিলি বললে, শুনুন, জাপানের 'নিচি নিচি সিম্বুন' কি বলছে।

—পড়, শুনি।

লিলি খবরের কাগজ পড়তে লাগল।

সেদিন কিন্তু শৈলবিহারীও ধৈর্যচ্যুতি হ'ল। ভোর চারটায় তিনি স্নান ক'রে পূজায় বসেন। তখনও অল্প অন্ধকার থাকে। সেই অন্ধকারে তিনি যখন স্নান সেরে বেরিয়ে আসছেন, সেই সময় তাঁর পায়ে ঠেকল—কি?—আস্ত একখানা হাড়!

ঘৃণায় তাঁর সমস্ত শরীর কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

তিনি তখনই সুরুচিকে ডেকে হাড়টা দেখালেন। ভয়ে সুরুচির প্রাণ উড়ে গেল। ওটা এখানে এল কি ক'রে? নিশ্চয়ই ইন্দুর কিংবা অন্য কিছুতে এনে থাকবে। তা ছাড়া....

শৈলবিহারী তর্ক করলেন না। আবার স্নান ক'রে এসে পূজায় বসলেন। পূজা ভালো হ'ল না, মন বসল না।

পূজা সেরে তিনি সুরুচিকে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কি তাঁদের ইচ্ছা? তিনি কি এ বাড়ি থেকে ওঠে যাবেন?

উঠে যাবেন? কেন? কি এমন হয়েছে? এমন কিছু অখাদ্য জন্তুরও হাড় নয়। কেউ ইচ্ছে ক'রে ওখানে রেখেও যায় নি। পায়ে ঠেকল, স্নান করা হ'ল, ফুরিয়ে গেল। তাই নিয়ে এত

বাড়াবাড়ি করতে হবে? সংসারে পিতৃভক্তি ব'লেও কি কিছু নেই?

পিতৃভক্তি! শৈলবিহারী ঠোঁট কোঁচকালেন। যিনি সমাজ, সংসার সমস্ত ত্যাগ ক'রে চিরকাল স্বেচ্ছাচার ক'রে এলেন। যাঁর খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই! লোভের তাড়নায় যিনি পিতৃপুরুষের ধর্মের পর্যন্ত মর্যাদা রাখেন নি!

অনেক দিন পরে শৈলবিহারী হাসলেন। কিন্তু এমন নিষ্ঠুরভাবে যে, সুরুচি একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

বললেন, না রাখেন নি। কিন্তু তাতে তোমার কি? পিতৃপুরুষের ধর্ম? তোমার তো উনিই পিতা। ওঁর ধর্মই তো তোমার ধর্ম।

—কখ্‌খনো না। আমি ব্রাহ্মণ, আমার পিতৃপুরুষের যে ধর্ম, তাই আমার ধর্ম। আমরা ওঁকে মৃত বলেই মনে করি।

—উত্তম ক'র! কিন্তু আমি এখনও ব্রহ্মণ্য ধর্মের ততখানি অনুরাগিণী হয়ে উঠতে পারি নি। উনি যখন এতকাল পরে ফিরেছেন, তখন কিছু কিছু অনাচার হবেই। আমি ছেলের বৌ হয়ে যদি তা সইতে পারি, তুমি ছেলে হয়েও তা সইতে পার না?

—না। এ বাড়িতে আমি কিছুতে আমার মায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে দোব না।

—বেশ তো। আমিও তো ছেলের মা। আমারও তো একটা মর্যাদা আছে।

শৈলবিহারী রাগ ক'রে বললেন, বেশ। তাহ'লে তোমাদের মর্যাদা নিয়ে তোমারই এ বাড়িতে থাক। আমি অন্য কোথাও উঠে যাচ্ছি।

সুরুচি তাতেও এতটুকু দমলেন না। বললেন, যেতে পার। কিন্তু

এমন কেলেঙ্কারী ক'রে যেতে পারবে না। বাবা জানতে পারবেন, সবাই জানতে পারবে, তাই নিয়ে কানাঘুসা করবে, সে হ'তে পারবে না। যেতে চাও দু'দিন পরে যেও। কিংবা আর কটা দিন থাক, কনকের কলেজ খুলুক, তারপরে আমিই বাবাকে নিয়ে ক'লকাতা যাব। সেই কটা দিন তোমার ব্রহ্মণ্য দেবতাকে একটু সাবধানে রেখ।

সুরুচি আর দাঁড়ালেন না। শৈলবিহারীও আস্তে আস্তে নিজের পড়ার ঘরে গিয়ে বসলেন। তারপর কনককে ডেকে পাঠালেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, দিন-রাত্তির তো হাসি-গল্প-গান শুনতে পাচ্ছি। পড় কখন?

—পড়ি তো।

—ছাই পড়। সে ছোঁড়া কোথায়?

—দাদা পড়ছে।

—হুঁ খুব পড়ায় চাড়! কাল শিকার থেকে ফিরল কখন?

কনক চুপ ক'রে রইল।

—যাও।

কনক পালিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। চুপি-চুপি দাদাকে গিয়ে সব কথা জানালে। শুনে রামেন্দুর মুখ শুকিয়ে গেল।

বললে, হঠাৎ সকালেই বকাবকি আরম্ভ করলেন যে!

ঠোঁট উল্‌টে কনক বললে, কি জানি! মেজাজ খুবই খারাপ। এখন দু'দিন শিকার-টিকার বন্ধ রাখ দাদা, যদি ভালো চাও।

—হুঁ।

রামেন্দু লম্বা মুখ ক'রে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

সকালের খানিকটা সময় সুমুখের লনে একা-একা বেড়িয়ে, খানিকটা সময় খবরের কাগজ নাড়াচাড়া ক'রে হালদারসাহেবের কাটল। তারপর খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে যেখানে সুরুচি তাঁর জন্যে রান্না করছিলেন, সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

—ব্যাপার কি বলতো ছোটমা ?

—কিসের ?

—সকালে সেই যে আমার টেবিলে চা'টা নামিয়ে দিয়ে গেলে তারপরে আর দেখাটি দিলে না।

—রান্না করছি যে বাবা, তাই সময় পাই নি।

—মানলাম ? কিন্তু তোমার মেয়ে তো রান্না করছে না। সেও তো ডুব মেরেছে।

—কোথায় গেল সে মুখপুড়ী ?

—মুখপুড়ীর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত তো বলতে পারছি না। তাই ভাবছিলাম কি হ'ল তোমাদের !

সুরুচি মুখে হাসি টেনে বললে, কিছুই হয় নি বাবা। আমি দেখছি সে কোথায় গেল।

এমন সময় বাইরের ঘরে লিলির ডাক শোনা গেল, দাদুভাই ! কোথায় আপনি ?

হালদারসাহেবের সমস্ত দেহ যেন এক মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল। সাগ্রহে তিনি সাড়া দিলেন, এই যে দিদিভাই, যাই।

পরে সুরুচির দিকে ফিরে বললেন, লিলি এসেছে ছোটমা। আমি চললাম। তুমি সেই মেয়েটার খবর নাও।

উনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরুচির চোখ জলে ভরে উঠল। এই অসহায় বৃদ্ধ, যাকে শিশু বললেও হয়, ঘণ্টাখানেক মেয়ে দুটোকে

না দেখে যিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন, তাঁর উপরও মানুষ রাগ করতে পারে ?

লিলি বললে, কনক কোথায় দাদুভাই ?

হালদারসাহেব গম্ভীরভাবে বললেন, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয় elope করেছে।

লিলি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল। বললে, কি রকম ?

—ছোটমা প্রথমে আমাকেই সন্দেহ করেছিলেন। তাই দেখা দিয়ে ব'লে এলাম, আমি নই, অন্য কোথাও সন্ধান কর।

চোখ টিপে লিলি বললে, সন্ধান বেশি করতে হবে না। কাছেই কোথাও আছে।

—কে ? মেয়ে না জামাই ?

—দু'জনেই খুঁজে দেখব নাকি ?

—দেখ দিকি। তোদের দু'জনকে এক ঘণ্টা না দেখলে আমার মনটা কেমন হাঁপিয়ে ওঠে।

—ওরে বাবা ! এ যে গভীর প্রেম !

—কার দাদুভাই ?—বলতে বলতে হাসতে হাসতে কনক এল।

—তোরই দিদি। ছিলি কোথায় ?

লজ্জিতভাবে কনক বললে, একটু পড়ছিলাম।

—একটু সামলে পড়িস ভাই। একেবারে যেন নিখোঁজ হস না।

কনক দাদুর কথার ইঙ্গিতটা বুঝেও না বোঝার ভান ক'রে বললে, আহা ! নিখোঁজ আবার কি ! আমি তো পাশের ঘরে পড়ছিলাম।

লিলি বললে, দাদু বলছিলেন, elope করেছিস।

—দাদু ক্রমেই incorrigible হয়ে উঠছেন। ওঁকে আর ভদ্র করা গেল না।

—ও। আমারই বুঝি সব দোষ? আর লিলি যে বললে, ভয় নেই, কাছেই দু'জন আছে?

কনক গিয়ে লিলির চুলের মুঠি ধরে বললে, বলেছিস ও কথা?

লিলি আর্তস্বরে বললে, না, না। মিথ্যে কথা।

কনক কোথা থেকে এক গাদা চিঠি নিয়ে এসে দাদুর কোলের উপর ফেলে দিয়ে বললে, আর লিলির এই সব কীর্তি-কাহিনী পড়ে দেখুন।

লিলি ব্যস্তভাবে সেই সব চিঠি কেড়ে নিতে গেল। কিন্তু হালদারসাহেব তার কতকগুলো তখন পকেটে পুরে ফেলেছেন। আর বাকিগুলো কনক নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

বিব্রত, লজ্জিত লিলি ছুটে পালাল।

হালদারসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কি এগুলো?

—চিঠি। লিলির আর দাদার।

—রামেন্দুর?

—হ্যাঁ।

—হুঁ! বেশ আছিস তোরা।

হালদারসাহেব হাসতে হাসতে চিঠিগুলো কনককে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, রেখে দে তোর কাছে। যখনি লিলি দুষ্টুমি করবে, তখনি একখানা এনে আমার হাতে দিবি। কিন্তু এ হ'ল কি? শৈলর মাথায় এক হাত টিকি। তোরা দুই ভাই-বোনে তাকে না ডুবিয়ে ছাড়বি না দেখছি। উঁ? প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কোথা কে ধরা পড়ে কে জানে? Good.

বিশ্বমোহনের মা দুপুরের দিকে এ বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। হালদারসাহেব তাঁর ঘরে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর নাক ডাকারও শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। এখানকার কলেজ সোমবারে খুলবে। তিমধ্যে কলেজে কিসের যেন একটা জোর বৈঠক চলেছে। কালকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত শৈলবিহারী এবং ডক্টর বড়ুয়া কলেজেই ছিলেন। আজকেও খেয়ে-দেয়েই দু'জনে বেরিয়ে গেছেন।

এমন সুযোগ কদাচিৎ মেলে। অঙ্কের খাতা-বই ফেলে রেখে কনক চুপি চুপি বেরিয়ে গেল বিশ্বমোহনের বাড়ি। একা ঘরে সে বেচারী ঘুমুচ্ছিল। তার নাকে-ঠোঁটে চুলের সুড়সুড়ি দিয়ে কনক ঘুম ভাঙালে।

বললে, শিগ্গির ওঠ। সর্বনাশ হয়ে গেছে।

বিশ্ব ধড়মড় করে উঠে বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

বললে, কি হয়েছে?

—আমাদের সমস্ত বিষয় দাদু জানতে পেরেছেন।

ভয়ে বিশুর মুখ পাংশু হয়ে উঠল। শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কি ক'রে জানতে পারলেন?

—লিলি ব'লে দিয়েছে।

—লিলি?—রাগে বিশুর মুখ লাল হয়ে উঠল। বললে, আর সে নিজে যে....

—সেও আমি সব ফাঁস ক'রে দিয়েছি।

কনক ফিক ক'রে হাসলে।

—বেশ ক'রেছ। কিন্তু....

বিশু চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ভাবতে লাগল। এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারীর আর শেষ থাকবে না।

—দাদু কি বললেন?

ওর বিছানার পাশে ধুপ ক'রে ব'সে পড়ে কনক বললে, কিচ্ছু না। শুধু বললেন, Good.

—বল কি?

—হ্যাঁ।—কনক মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল।

আনন্দে বিশ্বমোহন লাফিয়ে উঠল। এক হাত আকাশে তুলে বললে, Dadu is great. Long live Dadubhai:

—আঃ! শোন। চীৎকার কোরো না।

কনক ওকে শান্তভাবে বসালে। বললে, তোমাদের কলেজ তো খুলে যাচ্ছে। আমাদেরও দেরী নেই। শিগ্‌গীরই চ'লে যাব। পূজোর আগে আর হয়তো দেখা হবে না।

চক্ষের পলকে বিশ্বমোহনের মুখখানি করুন হয়ে উঠল। কনকের একখানি হাত চেপে ধ'রে ম্লানমুখে বললে, তুমি থাক, তুমি যেও না।

—সে কি হয়?

বিশ্বমোহন আর বলবার একটি কথাও খুঁজে পেলে না। একটুতেই তার চোখে জল এসে পড়ে। সেই উদ্গত অশ্রু গোপন করবার জন্যে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে কনক বললে, দাদু ভরসা দিয়েছেন, আমাকে নিয়ে তিনি বাসা করবেন।

সাগ্রহে বিশ্বমোহন বললে, সে খুব ভালো হবে। হস্টেলে দেখা করবার এত অসুবিধে যে, যেতেই ইচ্ছা করে না। বাসা করলে…

কনক বললে, বলেছেন তো। দেখি শেষ পর্যন্ত কি করেন। আজ কথাটা একবার মনে করিয়ে দোব।

দু'জনেই চুপ ক'রে রইল অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে।

একটু পরে বিশুর দিকে বড় বড় ছলছল চোখ তুলে কনক বললে, বাসা হ'লে তুমি যাবে তো? ভুলে যাবে না তো?

—ভুলে যাব? তোমাকে?

বিশুর শরীরটা শুধু একবার দুলে উঠল। শুধু একবার কনকের হাতখানিকে মুঠোর মধ্যে একটু চাপ দিলে।

অনেকক্ষণ পরে কনক হাতখানিকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আসি। দাদু উঠেছেন বোধ হয়। আমাকে খুঁজবেন হয় তো তখন···

তখন কি হতে পারে সেই সম্ভাবনায় ইঙ্গিত ক'রে হাসলে।

সেই দিন বিকেলে রামেন্দু এবং বিশ্বমোহন হালদারসাহেবের ঘরে প্রবেশ করলে। হালদারসাহেবের ঘরে ওরা ক্বচিৎ আসে। তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটে কনক এবং লিলির সাহচর্যে। রামেন্দু এবং বিশু যদি বা কখনও আসে, অল্প একটুক্ষণ বসেই চলে যায়, ব'সবেই বা কখন? সকালে ওদের পড়াশুনা আছে, বিকেলে আছে খেলাধূলা কিংবা শিকার।

হালদারসাহেব নিবিষ্ট মনে রোমা রোঁলার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পাঠ করছিলেন। ওদের দেখে বইটা নামিয়ে রেখে প্রসন্ন হাস্যে বললেন, এসো। কি মনে ক'রে?

—এমনি এলাম।

—এমনি আসার ছেলে তো তোমরা নও। বোসো।

—থাক।

বিশু জিজ্ঞাসা করলে, আপনার বাহন দুটি কোথায়?

বাহন দুটি? হালদারসাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তারা এখনও এসে জোটেনি। কেন বল দেখি? তাদের খোঁজেই এসেছ নাকি?

না, না, তাই জিগ্যেস করছিলাম।

রামেন্দু জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, আপনি অত পড়েন কেন? শুনি বিলেত থেকে মাসে মাসে আপনার বই আসে। অত বই পড়ে কি হয়?

হালদারসাহেব হেসে উত্তর দিলেন, আর কিছু না হোক সময় তো কাটে।

—শুধু সময় কাটাবার জন্যে? আর কিছু নয়?

—আর যাহা আছে তাহা বলবার নয়। বন্ধু, তোমাদের দেখেছি তোমরা পড় না। কিন্তু আমাদের কালে পড়াটাই ছিল ছেলেদের সব চেয়ে বড় বিলাস।

—কিন্তু কি হয় ওতে? কিছু শেখা যায়?

—বোধ হয় যায়। বোধ হয় বুদ্ধির কুয়াশা কাটে, চিন্তা-ধারা সত্য-পথের সন্ধান পায়। বোধ হয়....

রামেন্দু হেসে বললে, বোধ হয় কিছুই হয় না। আপনাদের কালে আপনারা অনেক পড়েছেন, কিন্তু কিছুই ক'রে যান নি। আমাদের কালে আমরা বেশি পড়ি না, কিন্তু কিছু ক'রে যেতে চাই। আমাদের একজন প্রোফেসার কি বলেন জানেন?

—না।

—তিনি বলেন, বেশি পড়লে বুদ্ধিটা ধনী হতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে বিলাসীও হয়।

—তোমাদের সেই ভদ্রলোক এখনও প্রোফেসারী করেন ?

—হ্যাঁ।

—বোধ হয় আর বেশি দিন করবেন না। কিন্তু আমাদের কালের অকর্মণ্যতার কথাই যখন তুললে তখন বলি, আমরা কিছু ক'রে যেতে পারি নি সত্যি, কিন্তু তোমরা যা করছ সেও আমাদেরই দান।

—কি করে ?

—যেমন ক'রে একটা যুগের চিন্তাধারা আর একটা যুগে কাজে পরিণত হয়। সত্যি, আমাদের চিন্তাধারা কিছুটা পোষাকী ছিল। তোমাদের কালে সেইটে আটপৌরে হয়ে উঠেছে।

ওরা দু'জনে চুপ ক'রে রইল।

তারপর বিশু বললে, আমাদের প্রোফেসার বলেন,

বাধা দিয়ে হালদারসাহেব বললেন, তাঁর কথা সুবিধে হ'লে একদিন তাঁর মুখ থেকেই শুনব। আপাততঃ তোমাদের নিজেদের যদি কিছু বলবার থাকে তো বল।

—দাদুভাই, দাদুভাই!

কনক এবং লিলি দু'জনেই, যাকে বলে, সেজে এসেছে। ওরা রামেন্দু ও বিশুর দিকে চাইলেই না। হালদারসাহেবের দুপাশে দু'জন দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বললে, যাবেন না ?

—কোথায় ?

—যেখানে যাবার কথা ছিল।

—কিন্তু আমার তো তোমাদের মতো পোষাক নেই ভাই। ভয় হচ্ছে, পাছে বেমানান হয়ে পড়ি।

রামেন্দু এবং বিশ্বমোহন বেগতিক বুঝে উঠে বেরিয়ে গেল।

হালদারসাহেব বললেন, ওই দেখ, যাদের মানাত তারা উঠে চলে গেল।

—যাক গে। আপনাকেই আমরা মানিয়ে নোব।

—তবে চল্।

চলতে চলতে হালদারসাহেব বললেন, আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস করি।

—স্বচ্ছন্দে।

—আচ্ছা, আমাদের কালে যাদের দেখেছি তোরা কি তারা ন'স?

লিলি হেসে জিজ্ঞাসা করলে, কেন মিলছে না?

—মাঝে মাঝে মেলে, মাঝে মাঝে মেলে না। তাদের মধ্যে যারা নোলক প'রে শাশুড়ীর পায়ে পায়ে ঘুরত তাদের কথা ছেড়েই দাও। যারা তোমাদের মতো, তাদের সঙ্গেও তো মেলে না।

—কেন?

—তারা ছিল শুধুই প্রজাপতি। তোরা তা ন'স।

—আমরা কি তবে?

—তোরা কখনও প্রজাপতি, কখনও বাজপাখী।

—সেটা বুঝেছেন?

ওরা পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি ক'রে হাসলে।

হালদারসাহেবও হাসলেন, বুঝেছি বই কি দিদি। তোদের দিকে চাইলে সেকথা কি কারও বুঝতে বাকি থাকে? কিন্তু আজ নাচ দেখাবি তো লিলি?

—দেখাব। তার জন্যেই তো সেজেছি। কিন্তু মনে রাখবেন, আজই প্রথম এবং শেষ।

—শেষ কেন?

—আর দেখাব না।

সেই ছোট নদীটি এখন দেখা যাচ্ছে। বিকালের রোদে তার জল চিকচিক করছে। পাশেই ক'টি আমলকী গাছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাতা নাড়ছে। সেই নির্দিষ্ট জায়গায় ওঁরা প্রায় এসে পড়েছেন।

[৭]

কলেজ থেকে ফিরে শৈলবিহারী পোষাক ছাড়বারও অবসর পেলেন না। সুরুচি ভিতরের দিকের বারান্দায় হালদারসাহেবের বালিশের অড়ে তাঁর নামের আদ্যক্ষর তুলছিলেন। শৈলবিহারী উত্তেজিতভাবে তাঁর সামনে এসে বললেন, শুনেছ?

শৈলবিহারী মানুষটি অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ। অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনাও তাঁর স্নায়ুকে সহজে চঞ্চল করে তোলে। সুরুচি সে কথা জানেন। তাই মাথা না তুলেই সংক্ষেপে বললেন, না।

—আমাদের কলেজের ছেলেরা স্ট্রাইক করেছে।

এতক্ষণে সুরুচির মনে হ'ল উত্তেজনার কারণটা নিতান্ত তুচ্ছ করবার মত নয়।

মাথা তুলে বললেন, সে আবার কি?

—হ্যাঁ। ছেলেরা স্ট্রাইক করেছে। কেউ ক্লাসে যায় নি। যারা যেতে চায়, তাদেরও বাধা দেওয়া হচ্ছে। এমন কি আমাদেরও। গেটের গোড়ায় ছেলেরা দল বেঁধে শুয়ে পড়েছে।

—বল কি গো?

—হ্যাঁ, শুনলে আশ্চর্য হবে, আমাদের রামেন্দু হয়েছে তাদের রিং-লিডার।

—আমাদের রামেন্দু ?

শৈলবিহারী বোধ হয় পোষাক ছাড়বার জন্যে ঘরের মধ্যে যাচ্ছিলেন। ফিরে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণুভাবে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমাদের রামেন্দুই দেখে এলাম, সেই সবচেয়ে বেশি মহাত্মার জয়নাদ দিচ্ছে। আর পতাকা ওড়াচ্ছে। আমাকে দেখে একটু ভয় পর্যন্ত পেলে না।

কিন্তু সুরুচির তবু যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

হেসে বললেন, হ্যাঁ গা সে যে রাত্রে একলা বাইরে বেরুতে পারে না।

—এখন একবার গিয়ে দেখে এস।

শৈলবিহারী উত্তেজিতভাবে ঘরে প্রবেশ করলেন।

এর পরে সুরুচির পক্ষে অক্ষর তোলার কাজে মন দেওয়া অসম্ভব। হাতের কাজ বারান্দায় ফেলে রেখে তিনিও স্বামীর পিছু পিছু ভিতরে গেলেন।

উত্তেজনার আধিক্যে শৈলবিহারী তাঁর দিকে ফিরেও চাইলেন না। পিছন ফিরে পোষাক ছাড়তে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পরে সুরুচি বললেন, সেই জন্যেই ওর ঘরে ক'দিন থেকে ফিস্ ফিস্ চলছিল।

সচকিতভাবে শৈলবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, তাই না কি ?

—হ্যাঁ, আর দলে দলে কেবল ছেলেরা আসছিল।

—একথা আমায় এতদিন বলনি কেন ?

—আমি কি ছাই জানি, ওরা ভিতরে ভিতরে এই মতলব আঁটছে ? ছেলেরা তো এমন কতই আসে। আমি ভাবলাম তাই বুঝি।

বিরক্তভাবে শৈলবিহারী শুধু বললেন, হুঁ।

সুরুচি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কেন স্ট্রাইক করেছে ছেলেরা ?

শৈলবিহারী বিরক্তভাবে বললেন, কে জানে!

তারপর বললেন, একটি প্রোফেসরের বিরুদ্ধে পুলিশ কি বুঝি রিপোর্ট করেছে, তাই তাঁকে ছাড়াবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এতেই বাবুদের রাগ।

—তা বাপু সেও তো অন্যায়। পুলিশ কার নামে কি লাগিয়েছে, আর অমনি তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে, এমনও তো ভালো নয়!

—ভালো নয়? তাদের কলেজ, তাদের যাকে খুশি রাখবে, যাকে খুশি তাড়াবে। এতে ছেলেদের বলবার কি আছে? তারা কেন জোট পাকিয়ে স্ট্রাইক করে?

সুরুচি এবার মেয়েদের স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে ছেলেদের পক্ষে ওকালতি ক'রে মোলায়েম সুরে বললেন, না, না। স্ট্রাইক করবে কেন, ওই কথাটাই বলতে চায়, যে ভদ্রলোক অনেকদিন আছেন, ওঁকে যেন ছাড়ান না হয়।

—ছেলেরা বললেই হয়ে গেল। জান, ওদিকে পুলিশ....। ভদ্রলোক কি করে জান?

—কি করে?

—বোমা তৈরী।

কথাটি উত্তেজনার মুখে চট্ করে বলে ফেলেই শৈলবিহারী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরালেন। সুরুচি চমকে উঠলেন। শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ক'রে জানলে?

—সবাই জানে।

—সবাই জানে? তিনি কি সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোমা তৈরী করেন?

—আরে বাপু, পুলিশ কি মিথ্যা কথা বলেছে? তাদের স্বার্থ কি, আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি!

বিরক্তভাবে সুরুচি বললেন, তুমি নিজে না বুঝলে আমার বুঝিয়ে দেবার সাধ্যি নেই। এখন ক'টা?

—তিনটে।

—এখন কি চা খাবে, না একটু পরে?

—একটু পরে।

—সুরুচি আবার নিজের কাজে গিয়ে মনোনিবেশ করলেন।

কিন্তু মন দেওয়া তাঁর পক্ষে নানা কারণে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। হালদারসাহেবের বালিশের অড়টা নিয়ে খানিকক্ষণ বৃথা চেষ্টা করার পর সুরুচি আবার ঘরে গেলেন। শৈলবিহারী তখন একটি আরাম কেদারায় ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে ঝিমুচ্ছিলেন, অথবা কিছু ভাবছিলেন, ঠিক করে বলবার উপায় ছিল না।

সুরুচি একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ গা, তা শেষ পর্যন্ত কি হবে মনে হচ্ছে?

শৈলবিহারীও সেই কথাই ভাবছিলেন।

চোখ মেলে বললেন, কাল প্রিন্সিপ্যাল পুলিশে খবর দেবেন। পুলিশ এসে ঠ্যাঙানি দেবে। ছেলেরা সুড় সুড় করে আবার কলেজে ঢুকবে। তাদের সব ফাইন হবে। আর যারা পাণ্ডা তাদের রাস্টিকেট হতেও পারে।

সুরুচি শিউরে উঠলেন।

পাশের ঘরে হালদারসাহেবের নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল। তাঁর ওঠবার সময়ও হয়েছে।

সুরুচি ব্যস্ত হয়ে বললেন, বাবা উঠেছেন বোধ হয়। তোমারও চা এই সময় দিই তাহলে?

—দাও।

হালদারসাহেব বোধ হয় অনেকক্ষণ উঠেছেন। বেতের চেয়ারটায় বসে তিনি খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

সুরুচিকে দেখে বললেন, তোমার মেয়েকে দেখছি না ছোটমা?

পাশের বাড়ি দেখিয়ে সুরুচি বললেন, বোধ হয় ওদের বাড়ি গেছে। যা চঞ্চল মেয়ে! এক জায়গায় সুস্থ হয়ে বসে থাকতে পারে না।

হালদারসাহেব হাসলেন। বললেন, শৈলর গলা পাচ্ছিলাম যেন। সে কি ফিরেছে?

সুরুচি ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে জানালেন, ফিরেছেন।

—এর মধ্যে?

—আজ কলেজ বন্ধ। ছেলেরা স্ট্রাইক না কি করেছে।

—এই দেখ! আমাদের রামেন্দু....

—সেও আছে। শুনছি সেই নাকি রিং-লীডার—পতাকা ওড়াচ্ছে, আর গান্ধীর জয়ধ্বনি করছে।

—দেখেছ! কি যে দিনকাল পড়েছে। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, ওই গান্ধীই ছেলেগুলোর মাথা না খেয়ে ছাড়বে না।

হালদারসাহেব চিন্তিতভাবে চা পান করতে লাগলেন। তাঁর মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল, ছেলেদের এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।

এমন সময় কনক আর লিলি ঝড়ের মত ঘরে এসে ঢুকল। চীৎকার করে বললে, শুনেছেন দাদু, কলেজের ছেলেরা স্ট্রাইক করেছে।

শৈলবিহারীর ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে সুরুচি তাড়াতাড়ি বললেন, এই, আস্তে।

কনক সঙ্গে সঙ্গে দমে গেল। গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বাবা ফিরেছেন নাকি ?

নিষ্প্রয়োজন বোধে কেউ আর এর জবাব দিলেন না।

ওদের দু'জনেরই মুখ-চোখ রক্তবর্ণ। দেহ ঘর্মাক্ত। কিছুতেই ওরা আর উৎসাহ দমন করতে পারছিল না।

চুপি চুপি বলতে লাগল, এমন সাক্‌সেস্‌ফুল স্ট্রাইক হয়েছে! একটিও ছেলে ক্লাসে যায় নি। এই দুরন্ত রোদ। গেটের গোড়ায় এতটুকু ছায়া নেই। মাটি তেতে আগুন। তাতেই ছেলেরা শুয়ে আছে। দেখে এমন কষ্ট হচ্ছে!

—তুই দেখলি কি করে ?—সুরুচি জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমরা গিয়েছিলাম যে!

সুরুচি হালদারসাহেবের দিকে চেয়ে বললেন, শুনলেন তো! আমি ভাবলাম বুঝি ও-বাড়ি গেছে।

হালদারসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কি চায় ওরা ?

—ওদের একটি প্রোফেসারকে ছাড়াবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে! তাঁকে ওরা রাখতে চায়।

—ওরা কি রাখবার মালিক ?

লিলি উত্তেজিতভাবে বললে, মালিক নয় ব'লেই তো স্ট্রাইক করতে হয়েছে। তাই এত দুঃখ সইছে।

হালদারসাহেব সম্মুখের বড় আয়নার দিকে চেয়ে তাঁর 'টাই'টি ঠিক করে নিলেন।

বললেন, তোমাদের দুঃখ সহার এই ফিলজফিটা আমি ঠিক বুঝতে

পারি না। এটা অনেকটা কাঁদুনি গাওয়ার মতো। কোনো শক্তিমান জাতি তার নিজের দাবী মেটাবার জন্যে প্রতিপক্ষের সদর দরজায় না খেয়ে শুয়ে থাকতে লজ্জাবোধ করত।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে কনক প্রশ্ন করলে, আপনাদের সময়ে এ রকম ক্ষেত্রে আপনারা কি করতেন বলুন তো?

চিন্তিতভাবে হালদারসাহেব বললেন, বোধ হয় কিছুই করতাম না। কিংবা সভাসমিতি করতাম এবং আমাদের অভিযোগের ন্যায্যতা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে সচেতন করবার চেষ্টা করতাম।

—তাতেও যদি ফল না হত?

—তাহলে বুঝতাম, আর কিছুতেই ফল হবে না।

লিলি আর কনক বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসল।

দাদু বিরক্তভাবে বললেন, কিন্তু তোমাদের এ পন্থাতেও যদি ফল না হয় তা হলে কি করবে?

—ফল না হয় কি দাদুভাই? ফল হতেই হবে। বিশ্বাসের ততখানি জোর না থাকলে কেউ এত দুঃখ সইতে পারে?

এবার হালদারসাহেব গভীর বিস্ময়ে ওদের দিকে চাইলেন। বললেন, যে সব ছেলেরা ক্লাসে যেতে চায়, আজ এমনি করে তাদের বাধা দিলে। কাল যদি ওরা পুলিশ আনে?

হালদারসাহেবের কথা শুনে ওরা খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, যদি কি দাদু! আজ না হয় খাতির করেছে, কাল তো পুলিশ ডাকবেই।

—তখন?

—তখন কি? পুলিশ এসে ওদের কতকগুলোর মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবে, কতকগুলোকে জেলে পাঠাবে। আপনি কি ভেবেছেন,

ওরা ভয় পেয়ে পালাবে? ওদের তাহলে আপনি চেনেন না। সে ছেলে ওরা নয়।

জেল এবং মাথা ফাটানোর কথায় হালদারসাহেব চম্‌কে উঠলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, না, না। এসব তো ভালো কথা নয়,—এসব কখনই ভালো কথা নয়।

এর উত্তরে লিলি কি একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় দূরে বহু কণ্ঠের জয়ধ্বনি উঠল। ওরা দু'জনে ব্যস্তভাবে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বহু লোকের পদক্ষেপে এমন ধূলো উঠেছে যে, মিছিলের ছেলে-গুলোকে স্পষ্ট করে চেনা যাচ্ছে না। কেবল তাদের হাতের পতাকায় এবং জয়ধ্বনিতে বোঝা যাচ্ছে যে, মিছিলটা ছেলেদের। উঁচু-নীচু পাহাড়ে রাস্তার উঁচু থেকে তারা একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপের মতো নেমে আসছিল। মিছিল বিশৃঙ্খল নয়। প্রতি সারিতে দু'জন ক'রে।

কনক এবং লিলি ডাকলে, দাদুভাই বাইরে আসুন।

দাদুভাই এবং তাঁর সঙ্গে সুরুচিও দুরু দুরু বক্ষে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

মিছিল তখন অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। ছেলেদের কারও কারও মাথায় গান্ধী টুপী, অনেকাংশেরই মাথা উন্মুক্ত। রৌদ্রে ভ্রমণের ফলে মুখ রক্তবর্ণ এবং ধূলায় মাথার চুল, এমন কি ভ্রূ পর্যন্ত ধূসর হয়ে গেছে।

অজগর ধীরে ধীরে ওদের গেটের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

সুরুচি উদ্বেগ-ব্যাকুল তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন, ওদের মধ্যে রামেন্দু কোথায় আছে। বারে বারে দেখেন, কিন্তু কিছুতে তাঁকে খুঁজে পান না।

এমন সময় মিছিল থেকে সামনের দুটি ছেলে এগিয়ে এসে সুরুচির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

তাদের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার লেশমাত্র ছিল না। ঝড়ের আগে মেঘ যেমন থম্ থম্ করে, ওদের মুখে তেমনি থমথমে ভাব।

বললে, এই পতাকা রামেন্দু আমাদের দিয়ে গেছে মা। ব'লে গেছে, নানা কারণে এর মূল্য অনেক বেড়েছে।

সুরুচি এতক্ষণ পর্যন্ত অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। কি যে ব্যাপারটা কিছুই তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, যেন স্বপ্ন দেখছিলেন।

এতক্ষণে যেন তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল।

জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু সে কোথায়? রামেন্দু?

ছেলেটি সুরুচির চোখের দিকে সোজা চাইলে। বললে, তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। তাকে, বিশ্বমোহনকে এবং আরও কয়েকজনকে। পুলিশ বিকেলের দিকে আমাদের ওপর লাঠিও চালিয়েছে। তাতেও জনকয়েক জখম হয়েছে।

—পুলিশ?

—হ্যাঁ।

—পুলিশ এসেছিল?

—হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত প্রিন্সিপ্যাল পুলিশকে খবর দেন। তারা এখন গেট পাহারা দিচ্ছে।

সকলে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। একটা আশ্চর্য, কঠিন নীরবতা সমস্ত স্থানটিকে আচ্ছন্ন করে ফেললে।

একটু পরে শান্তকণ্ঠে লিলি জিজ্ঞাসা করলে, আমরা কি আপনাদের কোন কাজে লাগতে পারি?

ছেলেটি চলে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে চিন্তিতভাবে বললে, বোধ হয়—না। এ আমাদের নিজেদের সংগ্রাম। বাইরের লোকের এতে স্থান নেই। কিন্তু আপনাদের এ সহানুভূতি আমাদের মনে থাকবে।

ছেলের দল জয়নাদ করতে করতে বিশ্বমোহনের বাড়ির দিকে চলল।

সেদিন বিকালে হালদারসাহেব আর বেড়াতে বার হলেন না। তাঁর মন কেমন মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল। সমস্তক্ষণ কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। তা ছাড়া সঙ্গীরও অভাব ছিল। সমস্ত বিকালটা কনক এবং লিলি কোথায় ছিল তারাই জানে। তারা এল সন্ধ্যায় পরে, ম্লান মুখে নয়, হাসতে হাসতে।

তবু এই একটি অপরাহ্ণেই যে তাদের মনে প্রকাণ্ড পরিবর্তন ঘটে গেছে, অত্যন্ত সাধারণ চোখেও তা বোঝা যায়। বেশের সে পারিপাট্য নেই, নেই শাড়ীর বর্ণবৈচিত্র্য। দু'জনেরই পরণে অত্যন্ত সাধারণ খদ্দরের শাদা শাড়ী। কিন্তু তা এমন আশ্চর্য মানিয়েছে যে, বোঝবার উপায় নেই তারা এই প্রথম খদ্দর ব্যবহার করছে। প্রথম ব্যবহারের আড়ষ্টতার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কনকের হাতে একটি ছোট প্যাকেট।

হাসতে হাসতে বললে, আমাদের জন্যে আপনার বোধ হয় বেড়াতে যাওয়া হয়নি?

—কোথায় গিয়েছিলি তোরা?

—বাইরে। আপনার জন্যে একটা জিনিস এনেছি দাদু।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ। কি জিনিস অনুমান করুন তো।

হালদারসাহেব প্যাকেটটির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলেন। বললেন, পাইপ তো নয়। তার প্যাকেট অত বড় হবে না।

—নিশ্চয়ই না।

—তবে? সংসারে আমাকে দেবার মতো আর কি জিনিস আছে জানি না তো।

লিলি প্যাকেটটি খুলে ওঁর চোখের সামনে ধরল।

একখানা ধুতি, খদ্দরের, মোটা ক্যাঁটকেঁটে।

দাদু সবিস্ময়ে বললেন, এ কি করেছিস রে! আমি মিহি ধুতিই পরতে পারি না, তাতে খদ্দর! শুধু শুধু অর্থ নষ্ট করলি ভাই!

—আপনি পরলেই আর অর্থ নষ্ট হবে না।

হালদারসাহেব নিঃশব্দে ওদের পরণের শাড়ীর দিকে চাইলেন। বললেন, তোদের জন্যেও কিনলি বুঝি?

—হ্যাঁ।

লিলি বললে, ভাবলাম আপনাকে খদ্দর পরাতে পারলে কি আনন্দই না হবে।

হালদারসাহেব হাসলেন। বললেন, সখ করে একদিন খদ্দর পরাতে চাও পরাও। কিন্তু যে-মন নিয়ে তোমরা খদ্দর পরেছ, সে মন আমি পাব কোথায়?

কনক বললে, পাবেনই না বা কেন? দেশ কি আমাদের একার?

—তবে কার?

—আপনাদের নয়?

হালদারসাহেব হেসে ঘাড় নাড়লেন। বললেন, না। আমাদের

ভারতবর্ষ কবে ফুরিয়ে গেছে। এখন নতুন দেশ, নতুন যুগ, নতুন ধর্ম, নতুন মানুষের পালা। এর মধ্যে আমাদের ঠাঁই নেই।

—ঠাঁই করে নেওয়া যায় না?

—বোধ হয় না। দেশ মানে তো শুধু মাটি নয়—জল হাওয়া নয়—গিরি নদী, বনও নয়। দেশ মানে একটা উপলব্ধি। আমাদের কালের উপলব্ধির সঙ্গে তোমাদের উপলব্ধির তো বনবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরো এই খদ্দর। আমি একে এক টুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারব না। তোমাদের খাতিরে একে যদি গ্রহণও করি, আমার বিলিতি পোষাকের কাপড়ের চেয়ে নিকৃষ্ট বলেই গ্রহণ করব।

কনক এবং লিলি অভিমান করলে না। তারা জানে দাদুভাই মিথ্যা বলেন না। শান্তভাবেই বললে, তা হলে থাক দাদুভাই। আপনাকে আর খদ্দর পরে কাজ নেই। কিন্তু দেশ কি সত্যি সত্যি এতই বদলে গেছে?

—সে তোরা ভাবতে পারবি না। আমরা ভাবতাম, ভারতের কল্যাণ ইংরিজি পোষাক এবং ইংরিজি খানার উপর নির্ভর করে। আচারে ব্যবহারে ইংরেজ হয়ে উঠতে পারলেই আমরা মুক্তি পাব। এখন কি তোরা সেকথা ভাবিস?

ওরা হাসলে।

—কিন্তু সে ধারণা কি এতদিনেও বদলালো না?

—কি করে বদলাবে? জাপানের দিকে চাইলে এ ধারণা তো তোমরাও হেসে উড়িয়ে দিতে পার না?

—কিন্তু সারা ভারতবর্ষের লোক সত্যিই কি কোনোদিন আচারে ব্যবহারে ইংরেজ হয়ে যেতে পারে?

—পারে না, তাই বা বলি কি করে? কোনো কোনো দেশ তো পেরেছে।

ওরা এ কথার জবাব দিতে পারলে না।

হালদারসাহেব মাথা চুলকে বললেন, ভাবি কঠিন সমস্যা দিদিভাই। কি ভালো আর কি মন্দ, কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, কিছুই বোঝা গেল না, কিছুই বোঝা গেল না।

—তবু চূড়ান্ত সত্য বলে একটা কিছু তো আছেই।

—খুব সন্দেহের বিষয়। যুগে-যুগে, দেশে-দেশে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সত্যের রূপ কেবলই বদলেছে। এক পক্ষের সত্যের সঙ্গে আর এক পক্ষের সত্যের ক্রমাগত বেধেছে জেহাদ। কিন্তু তাতেও মীমাংসা হয় নি। সমষ্টি জীবনের কথা ছেড়ে দাও, আমার জীবনেই পরের পর সত্যকে কতবার যে রূপ বদলাতে দেখলাম তার ইয়ত্তা নেই।

হালদারসাহেব দাঁড়িয়ে উঠে ওদের দু'জনকে দুই বাহুর মধ্যে নিয়ে বললেন, আমার সঙ্গে তোমাদের মতের মিল হল না ব'লে দুঃখিত হয়ো না, কুণ্ঠিত হয়ো না, দ্বিধাগ্রস্তও হয়ো না। সকলের সঙ্গে সকলের সব জায়গায় মিল হবে—এ একটা অস্বাভাবিক আশা। আমাদের শুধু দেখতে হবে, মতের অমিলকে উপলক্ষ করে আমরা যেন পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে না ভুলি।

এ কথায় লিলি এবং কনকের মন অনেকখানি হাল্‌কা হ'ল।

এর পরে কতকগুলো অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রীতিকর ঘটনা অত্যন্ত দ্রুত-বেগে এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের উপর যেন সম্মার্জনী বুলিয়ে গেল।

কলেজগেটে বহু ছেলে পুলিশের লাঠিতে আহত হ'ল; কতকগুলি গ্রেপ্তার হ'ল। ছোট কলেজ, ছেলে বেশি নয়। সকলেই সকলের পরিচিত, এমন কি তাদের অভিভাবকগুলি পর্যন্ত। পুলিশের হাঙ্গামা আরম্ভ হতেই তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। ছেলেদের উপর কলেজে যাবার জন্যে তাঁরাও প্রচণ্ড চাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের চাপের চেয়ে বন্ধুবান্ধবের পরিহাসের তীক্ষ্ণতা অনেক বেশি। ছেলেরা যথাসময়ে বই হাতে করে কলেজে যাবার জন্যে বার হয়। কলেজেও আসে কিন্তু ক্লাসে যায় না। কলেজগেটে পিকেটিং করে। কেউ জেলে যায়, কেউ বা মার খায়।

অবশেষে প্রিন্সিপ্যাল বাধ্য হয়ে কলেজ ছুটি দিয়ে দিলেন। যারা হস্টেলে থাকত, নিরুপায় হয়ে তাদের বাড়ি যেতে হল। স্থানীয় ছেলেরা ছাত্রসঙ্ঘ করে ধর্মঘটের শক্তি রক্ষা করতে লাগল। কলেজ বন্ধ করার ফলে সামান্য উপকার হয় তো হ'ল। কিন্তু সে বিশেষ কিছু নয়। পিকেটিং বন্ধ হ'ল কারণ পিকেটিং করার প্রয়োজন রইল না। কিন্তু যেখানে ছাত্রসঙ্ঘের অস্তিত্ব মাত্রও ছিল না, সেখানে এই একটা কাণ্ডে ছাত্রসঙ্ঘ শুধু যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল তাই নয়, প্রবল হয়ে উঠল।

প্রিন্সিপ্যাল-সাহেব নিতান্ত নিরীহ অধ্যাপক মানুষ। রাজনীতির আবর্তে ইতিপূর্বে কখনও তিনি পড়েন নি, সে প্রয়োজনও হয় নি। পুলিশকে নিজে তিনি বাঘের মতো ভয় করতেন এবং আশা করেছিলেন ছাত্রেরাও তাই করবে। সে আশা ব্যর্থ হ'ল। অধিকন্তু যাদের সংস্রব

এবং ছোঁয়াচ তিনি সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে চলতেন, সেই পুলিশ একেবারে তাঁর ঘাড়ের উপরে জেঁকে বসল।

শুধু পুলিশ নয়, সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসেরও আবির্ভাব হ'ল। পুলিশ তার স্থূল পন্থায় প্রথম চোটেই এমন একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করলে যে, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ ছাত্রদল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তারা তৎক্ষণাৎ কংগ্রেসের শরণ নিলে। এই চাকুরীজীবী ছোট সহরে কংগ্রেস কমিটির একটি অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু বন্যা, দুর্ভিক্ষ অথবা কোন বড় রকমের রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া অন্য সময়ে তার অস্তিত্ব তেমন উপলব্ধি করতে পারা যেত না। এই উপলক্ষে কংগ্রেস কমিটিতেও আবার স্রোত দেখা দিলে। তাঁদের কাছ থেকে সাহস অভয় এবং প্রেরণা পেয়ে ছাত্রের দল আবার ঘুরে দাঁড়াল।

প্রিন্সিপ্যাল বিব্রত হয়ে উঠলেন। একদিকে পুলিশ, অন্যদিকে কংগ্রেস। এই দুই প্রচণ্ড শক্তি তাঁকে যেন মন্থন করতে লাগল। খবরের কাগজে দিনের পর দিন ধর্মঘটের বিবরণ বার হয়, তার সঙ্গে কটু সম্পাদকীয় মন্তব্য। ভদ্রলোকের জীবন দুর্বহ এবং দিনের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্ন ক্লেদাক্ত হয়ে উঠল।

এই কলেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আজকের নয়। ছাত্রমহলে তাঁর খ্যাতি ছিল, প্রতিপত্তিও ছিল। তাঁর মুখের একটা কথায় হাজার ছেলে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারত। কি করে যে কি হয়ে গেল, তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় সেই ছেলের দল আজ তাঁরই বিরুদ্ধে সংগ্রামে মেতেছে।

জীবনে এর চেয়ে বড় দুর্ভোগ আছে? গুরুশিষ্যের মধ্যে সম্পর্কে সেই মাধুর্যই যদি না রইল, তবে আর রইল কি?

ভালো লাগে না। মিনিটে মিনিটে পুলিশ আসে। তাঁকে উপদেশ

দেয়,—এই করা উচিত, এই করা উচিত নয়। আসেন কংগ্রেসের লোকেরা—নিত্য নতুন আপোষের সর্ত দেন। আর খবরের কাগজে দেয় গালাগালি। কেউ বোঝে না, তাঁর হাত কোথায় বাঁধা আছে।

কলেজে অন্যান্য অধ্যাপকদের ডেকে বললেন, আর ভালো লাগে না বুড়ো বয়সে এই টানাটানি। চাকরী ছেড়ে দেব।

অধ্যাপকদের অনেকে তাঁর ছাত্র, অনেকে ছাত্র নন।

তাঁরা বললেন, সর্বনাশ! আপনি গেলে এই কলেজের থাকবে কি?

ম্লান হেসে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, সবই থাকবে। এই দু'লাখ টাকার বাড়ি, পঞ্চাশ হাজার টাকার ল্যাবরেটরী, ষাট হাজার টাকার লাইব্রেরী, থাকবে তোমরা—বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি রত্ন। আমি এর কিছুই নিয়ে যাব না। খালি হাতেই যাব।

অধ্যাপকেরা একসঙ্গে ঘাড় নাড়লেন। বললেন, সে হয় না।

—কিন্তু এরই বা মানে কি আমায় বলতে পার? আমার ছেলেদের কে পড়াবেন, না পড়াবেন তা স্থির করবেন গবর্ণমেন্ট। আর আমার ছেলেরা আমারই বিরুদ্ধে করবে লড়াই। এর পরেও কলেজে থাকতে বল তোমরা?

অধ্যাপকেরা চুপ করে রইলেন।

প্রিন্সিপ্যাল বলতে লাগলেন: আমরা এখানে বিদ্যের দোকান খুলে বসেছি। ছেলেরা টাকা দেবে এবং ওজন করে বিদ্যে নেবে। এর মধ্যে গুরুশিষ্যের কোন সম্পর্ক নেই। এ হ'ল দোকানদারী ব্যাপার। তবু এরই মধ্যে গুরুশিষ্যের সেই মধুর সম্পর্ক যদি কোথাও একটুখানি গড়ে ওঠে, পুলিশের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাও যাবে গুঁড়িয়ে। এই তো ব্যাপার।

বাড়ি ফিরে তিনি গৃহিণীকেও ঠিক এই কথাই বললেন: আর ভালো লাগে না!

গৃহিণী প্রথমে ব্যাপারটি রসিকতা ভেবেই উড়িয়ে দিলেন, তারপর যখন বুঝলেন রসিকতা নয়, তখন বললেন খাবে কি?

—যা জোটে। নুন ভাত।

—ছেলেরা?

প্রিন্সিপ্যাল এবার চুপ করলেন। বড় ছেলে বছর কয়েক হ'ল বিলেত গেছে আইন পড়তে। মেজ ছেলে এবার এম. এ. দেবে। সেও আসছেবার যাবে বিলেত। তারপরেও আরও কতকগুলি আছে ছোট-ছোট।

গৃহিণী আবার বললেন, মেয়েগুলোর বিয়ে?

প্রিন্সিপ্যাল শুধু বললেন, হুঁ।

ধর্মঘট যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

ইতিমধ্যে শৈলবিহারী খদ্দর ছেড়ে দিলেন।

রামেন্দুর জেলে যাওয়ার ফলে তাঁর বিপত্তি বেড়েছে। পুলিশ ক'বারই এসে অনেক কিছু প্রশ্ন করে গেছে। শৈলবিহারীর ভয় হয়েছে, পাছে পুলিশের স্নেহদৃষ্টিতে তাঁরও চাকরীটি যায়।

কিন্তু সে কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে তাঁর লজ্জা হয়। প্রকাশ্যে তিনি এই কথা বলেন যে, খদ্দর যে ভারতের বস্ত্রসমস্যার সমাধান করবে এবং মিলের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে, এ বিশ্বাস তাঁর আর নেই। সেই কারণেই তিনি খদ্দর ছেড়েছেন এবং ছেড়ে ভালোই করেছেন, বন্ধু মহলে এই কথাই তিনি প্রতিপন্ন করতে চান।

কংগ্রেসের সম্বন্ধেও এখন যে তাঁর যথেষ্ট প্রীতি আছে, তাও মনে হয় না। কতকগুলি অপরিণতবয়স্ক ছেলেমেয়ের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু যে কংগ্রেসের দ্বারা হবে, সে কথাও এখন আর তিনি মনে করেন না। বরং তিনি এখন একথা স্বীকার করতেও প্রস্তুত হয়েছেন যে, তাঁদের বাপেদের আমলে ইংরেজি পোষাক পরিধান, অখাদ্য ভোজন ও অপেয় পানের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা আনার যে স্বপ্ন চলছিল, এর চেয়ে তাও ছিল ভালো। তার মধ্যে দম্ভ ছিল, বিশ্বাস ছিল, কিছু পরিমাণ স্বেচ্ছাচারিতার আনন্দও ছিল। কিন্তু এ তো তা নয়,—এযে একেবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

শৈলবিহারী এই নিয়েই একদিন হালদারসাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন।

পাশাপাশি ঘরে থেকেও পিতাপুত্রে অনেকদিন সাক্ষাৎ নেই। বলতে কি, বাপের কথা তাঁর নিতান্ত আকস্মিকভাবেই মনে পড়ে গেল। ইতিপূর্বে যে ঘন-ঘন উচ্চ কণ্ঠের হাসি, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এবং একটি বিশেষ ভঙ্গীর থুপথুপে ভারি হাঁটন, তাঁর অস্তিত্বের কথা সকল সময়ে স্মরণ করিয়ে দিত, এখন আর তা শৈলবিহারীর মনেও পড়ে না।

তাঁর ঘরে গিয়ে শৈলবিহারী দেখলেন, বড় টেবিলের উপর ঝুঁকে কি যেন একখানা মোটা বই হালদারসাহেব গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করছেন। একদিকের কোণে কনক একখানা বাঙলা মাসিক পত্রিকার পাতা ক্রমাগত উল্টে যাচ্ছে। তার ধবধবে শাদা, কাবুলী বিড়ালটা পায়ের কাছে বহুবার ঘোরাফেরা ক'রেও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে নৈরাশ্যে ও বৈরাগ্যভরে পিঠটা ধনুকের মত বেঁকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করছে।

শৈলবিহারী একবার গিয়ে ফিরে এলেন। দ্বিতীয় বার তাঁর কথাটা

পাড়লেন, যুক্তিও দিলেন। হালদারসাহেব চোখের চশমাটা খুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। তারপর নিঃশব্দে আবার পড়ায় মন দিলেন। ভালো মন্দ কোন জবাবই দিলেন না।

হালদারসাহেব ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। বাঙলা দেশে তাঁদের সে যুগ যে শেষ হয়ে গেছে, নেপালে বসে সে কথা তিনি টের পান নি। এখন তিনি বুঝলেন, এ একেবারে "New faces, other minds." এরা নতুন মানুষ, এদের নতুন মন, নতুন দৃষ্টি। তাঁর অবস্থা হয়েছে রিপ্‌ভ্যান্‌ উইঙ্কলের মতো। দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসে তাঁর সেই পুরাণ বাঙলাকে আর ফিরে পাচ্ছেন না।

কোথায় সে বাঙলা দেশ যেখানে একাদশী মেয়েরা নাকে নোলক পরে শ্বশুরবাড়ি যেত, যেখানে অশিক্ষিতা গৃহস্থ বধূ একগলা ঘোমটা দিয়ে ভোর থেকে নিশীথ রাত্রি পর্যন্ত গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকত, সাধারণ লোকে যখন শাক-ভাতেই সন্তুষ্ট থেকে প্রবাসে যেতে চাইত না? সে বাঙলার সঙ্গে আজকের বাঙলার মিল কোথায়?

অনেকক্ষণ পরে চোখ তুলে হালদারসাহেব বললেন, দেখ শৈল, আমাদের যুগের চালচলন, আমাদের যুগের চিন্তাধারা, তার সম্বন্ধে আমার একটা মোহ আছে। তবু সেই ভালো ছিল কিংবা আজকে যে হাওয়া বইছে, তাই ভালো, সে সম্বন্ধে আমি কিছুতেই নিঃসংশয় হতে পারছি না। একটা ঘূর্ণির মতো উঠে রামেন্দু আমার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। তোমাকে বলছি, এখনকার ছেলেদের সম্বন্ধে আমার বিস্ময়ের আর শেষ নেই।

শৈলবিহারী বাধা দিয়ে বললেন, কিন্তু তার ফল কি হচ্ছে?

হালদারসাহেব হেসে বললেন, ফলের জন্য এখনই ব্যস্ত হয়ো না। ব্যাপারটা বোঝ; ইংরিজি পোষাক পরে আর ইংরিজি ভাষা শিখে আমরা

ভেবেছিলাম, এবার আমরা সভ্য হয়েছি! ভেবেছিলাম, আমাদের সাজসজ্জা দেখে, আমাদের মুখের চোস্ত ইংরিজি ভাষা শুনে সাহেবরা এইবার দয়া ক'রে আমাদের দাসত্ব মোচন ক'রে দেবেন। কিন্তু তারা তা দিলেন না। তোমাদের মনে এর একটা প্রতিক্রিয়া হ'ল। সাহেবিয়ানা থেকে তোমরা ঘুরে দাঁড়ালে, টিকি রাখলে, গীতা পড়লে, কেউ বৈজ্ঞানিক পন্থায়, কেউবা সনাতনী পন্থায় সাধন-ভজন, সন্ধ্যা-আহ্নিকে মন দিলে। তার ফলে পারলৌকিক উপকার কতখানি হ'ল তোমরাই জান, কিন্তু ইহলৌকিক উন্নতির বিশেষ কিছু দেখা গেল না।

হালদারসাহেব হতাশভাবে ঘাড় নাড়লেন।

—তার জের এখনও মেটে নি শৈল। তোমার গান্ধী বল, অরবিন্দ বল, সমস্তই সাধন-ভজন, সন্ধ্যাহ্নিকের রাজনৈতিক সংস্করণ। কারও মধ্যে পাঁচ সের সাধন-ভজনের সঙ্গে পাঁচ সের রাজনীতি মিশেছে। কারও বা দশ সের সাধন-ভজনের সঙ্গে পাঁচ সের রাজনীতি মিশেছে। কেবল ডোজের তফাৎ, বুঝলে?

হালদারসাহেব হাসলেন।

এ সমস্ত কথার বিরুদ্ধে শৈলবিহারীর অনেক কিছু বলবার ছিল। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। শুধু শুনে যেতে লাগলেন।

হালদারসাহেব পুনশ্চ বললেন, ইতিমধ্যে এল এরা। সমাজ মানে না, ধর্ম মানে না, দাম্পত্য সম্পর্কে পবিত্রতা পর্যন্ত স্বীকার করে না। তাকে আঘাত দেয় না, কেবল নিঃশব্দে উপেক্ষা করে যায়। এরাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে শৈল, এদেরই আমি বুঝতে পারছি না।

হালদারসাহেব সশব্দে হাত দু'খানা টেবিলের উপর নামালেন।

কনকের হাতের কাগজখানা বোধ হয় আলগাভাবে ধরা ছিল। সেই শব্দে সেখানা নীচে পড়ে গেল।

হালদারসাহেব ওর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন দেখলেন। আপন মনেই বললেন, good.

শৈলবিহারী বললেন, ওদের বোঝা বোধ হয় একটু শক্তই হয়েছে। কিন্তু সে বোধ হয় অন্য কারণে।

—কি কারণে?

—এই কারণে যে, ওরা এদেশের নয়, রাশিয়ার। নদীর জলের সঙ্গে পুকুরের জলের মিল আছে। কিন্তু মদ স্বতন্ত্র জিনিস। একমাত্র সাদৃশ্য ছাড়া স্বাদে, গন্ধে কোথাও তার সঙ্গে জলের মিল নেই।

বিস্মিতভাবে হালদারসাহেব বললেন, বল কি?

—হ্যাঁ। ওরা আলোক লতার মতো দেশের বাতাসে ভাসছে। এদেশের ঐতিহ্য, এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ওদের শিকড়ের যোগ নেই।

হালদারসাহেব বিস্মিতভাবে কনকের দিকে চাইলেন। কিন্তু তার মুখ দেখা গেল না। সে তাড়াতাড়ি খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে।

শৈলবিহারী চলে গেলে কনক খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইলে, বললে, আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন, আমরা রাশিয়া থেকে আসছি?

হালদারসাহেব হেসে বললে, সে তোরাই জানিস্। কিন্তু শৈলর কথাটাও একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। যেখান থেকেই তোরা আসিস, তোদের গায়ে রুশীয় গন্ধ আছে।

—গন্ধ আসে কি করে? রাশিয়া আমরা চোখে দেখলাম না। জন্মালাম এই দেশে, বড় হলাম এই দেশে, চাই এই দেশের স্বাধীনতা

অথচ গন্ধ আসে রাশিয়ার? কারণ, আমরা সর্বমানবের মুক্তি চাই? গন্ধ তো সেই সোস্যালিজমের?

—না। সোস্যালিজমের নীতি রাশিয়ার একচেটিয়া নয়। কিন্তু নিজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে রাশিয়া সেই নীতিকে একটা নিজস্ব রূপ দিয়েছে। তারই এক ফোঁটা এসেন্স তোমাদের বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন ভেজিটেবল্ নীতিতে মিশেছে। দেখলে মনে হয়, রাশিয়ার খাঁটি গাওয়া ঘি। কিন্তু....

কনক হেসে বললে, দিন পনের পরেই টের পাওয়া যাবে তা নয়। কেমন না?

—হ্যাঁ। তোমরা শুধু সোস্যালিজমই তো নাওনি, নিয়েছে রাশিয়ার থার্ড ইণ্টার-ন্যাশানাল চুঁইয়ে যে সোস্যালিজম এসেছে তাই।

—কিন্তু....

—কিন্তু আমার কথাই তুমি বেদবাক্য বলে মেনে নিও না। এ বিষয়ে আমার পড়াশুনা এত কম এবং জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ যে, সাধারণ বুদ্ধি ছাড়া আর কোন সম্বলই আমার নেই। সেকেলে বুড়ো মানুষের সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে আমি তোমাদের কখনই বলতে পারি না।

কনক হেসে বললে, আপনি বুড়ো মানুষ হতে পারেন, কিন্তু সেকেলে নন।

—বলিস কি! বুড়ো হলে সেকেলে হয় না?

—কেউ কেউ হয় না। আপনিও হননি। আপনার মতামত আমাদের থেকে পিছিয়ে নেই।

হালদারসাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললেন, আছেরে আছে। তোরা টের পাস না। আমার যুগের

থেকে আমি একটা চিন্তাধারার Catholicity পেয়েছি। অনেক সময় তাকেই তোরা আমার মত বলে ভুল করিস। কিন্তু থাক সে কথা। আসল কথা বল দেখি।

—কি আসল কথা ?

—রামেন্দুর খবর কি ? বিশুর খবর কি ? আরও যাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের খবর কি ?

—শুনছি তো ছাড়া পাবে।

হালদারসাহেব উৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, ছাড়া পাবে কি রকম ?

—সে অনেক কথা। প্রথমে নাকি ওদের বলা হয়েছিল, ওরা যদি ক্ষমা চায়, তাহলে ছেড়ে দেবে। ওরা তাতে রাজি হয় নি। এখন শুনছি, ধর্মঘট মিটমাটের নাকি কথা হচ্ছে। বোধ হয় মিটমাট হয়েও যাবে। তখন ওরা মামলা তুলে নিতে পারে।

হালদারসাহেব গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, মিটমাটের কথাটা উঠল কোন্ দিক থেকে ?

—উঠেছে বোধ হয় জনসাধারণের তরফ থেকে। এখন শুনছি প্রিন্সিপ্যালের নিজেরও যথেষ্ট আগ্রহ আছে। ছেলেদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তার কিছু কিছু নাকি তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। ছেলেদের তিনি তো কম ভালোবাসতেন না। সে দৃশ্য দেখে তিনি নাকি চাকরী ছেড়ে দিতেই যাচ্ছিলেন। মিটমাটে তাঁরই আগ্রহ নাকি সকলের চেয়ে বেশি।

—কি ভাবে মিটমাট হতে পারে, কিছু শুনেছিস ?

মাসিক কাগজখানা ভালো করে তুলে রেখে কনক বললে, সেইটাই আসল কথা। মুস্কিল হয়েছে, সেই প্রোফেসারটিকে কি ভাবে আবার

বহাল করা যায়? গবর্ণমেণ্টের জেদ তাঁকে তাড়াতেই হবে, ছেলেদের জেদ তাঁকে রাখতেই হবে।

—তা হলে? তাঁকে বহাল রেখে তাড়ানো যাবে কি করে?

কনক হেসে বললে, সেই ফর্মুলাই আবিষ্কার করার চেষ্টা হচ্ছে।

—কি ভাবে?

—বুঝতেই পারছেন, যে প্রোফেসারের জন্যে ছেলেরা এত দুঃখ সইতে পারে, তিনি কি পরিমাণ ছেলেদের ভালোবাসেন। তাদের দুঃখ সওয়ার পরিমাণ দেখে তিনিও কম বিচলিত হননি। তিনি নাকি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে রাজি হয়েছিলেন।

—তারপরে?

—কিন্তু ছেলেরা তাতেও রাজি নয়।

হালদারসাহেব উত্তেজিতভাবে বললেন, এ ভারি অন্যায়!

—তারা বলছে, অন্তত পূজো পর্যন্ত ওঁকে থাকতেই হবে। তার পরে উনি পদত্যাগ ক'রে চলে যেতে পারেন।

হালদারসাহেব চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে কি ওঁরা রাজি হবেন?

মুখ টিপে হেসে কনক বললে, বোধ হয় হবেন।

—হুঁ।—হালদারসাহেব একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেললেন।

একটু পরে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছিলে কনক, ওরা জানতো ওরা জিতবে। সে বিশ্বাসের জোর না থাকলে এত দুঃখ সইতে পারত না। আমার এখন কি মনে হচ্ছে জানিস?

—কি মনে হচ্ছে?

—ওদের জেলে যাওয়ার জন্যে এতটুকু দুঃখ হচ্ছে না।

অনেকদিন পরে হালদারসাহেব হো হো করে হাসলেন।

কনক বললে, তাতেও আপনার দুঃখ ঘুচবে না।

—কেন?

—পুলিশ পেছনে লেগেছে। ওদের intern করতে পারে।

হালদারসাহেবের মুখ শুকিয়ে গেল। বললেন, বলিস কি?

—সেই রকমই বোধ হচ্ছে। এই ব্যাপারে কতকগুলো ছেলেকে বোধ হয় পুলিশ ছাড়বে না। ওরা সেই প্রফেসারটির বাড়ি খানাতল্লাস করে কি সব নাকি চিঠি পেয়েছে। তাই নিয়ে এখানে অনেক রকম খোঁজখবরও করে গেছে। ব্যাপার খুব সুবিধার নয়।

কনক হাসলে।

হালদারসাহেব বিরক্তভাবে বললেন, হাসছিস?

—কি করব? চলুন বাইরে লনে গিয়ে বসিগে।

হালদারসাহেব নিঃশব্দে বসে রইলেন। ওঠবার কোন লক্ষণ দেখালেন না। বোধ হয় কনকের কথা শুনতেই পান নি।

[৯]

এবারে গরম পড়েছে বেজায়। আটটা বাজতে না বাজতেই বাইরে এমন রোদ উঠেছে যে, চাওয়া যায় না। হালদারসাহেব ঘরের মধ্যে কি একখানা বই খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়ছিলেন। এমন সময় ঘরের মধ্যে যেন কার ছায়া পড়ল। হালদারসাহেব মুখ তুলে চাইতে না চাইতেই রামেন্দু এবং বিশ্বমোহন এসে ঢিপ করে তাঁকে প্রণাম করলে।

হালদারসাহেব যেন চমকে উঠলেন।

—রামেন্দু! বিশু! থাক, থাক, থাক, আর প্রণাম করতে হবে না। এ যুগে প্রণাম অচল।

উনি ওদের দু'জনকে হাত ধরে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তার পর ওঁর অনর্গল বক্তৃতা সুরু হল:

—আমরাও আশা করেছিলাম, তোমরা আজ-কালের মধ্যেই ছাড়া পাবে। কিন্তু এখনই যে আসবে তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তোমাদের মিছিল কই? আমরা তো ভাবছিলাম, ধূলো উড়িয়ে মিছিল করে সমস্ত সহরকে জানিয়ে তোমরা আসবে। কিন্তু এলে একেবারে চুপে চুপে, দক্ষিণা বাতাসের মতো? উঁ? এর জন্যেও আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তারপর? ওরে, রামেন্দু এসেছে, বিশু এসেছে! বোসো, তোমরা বোসো। কিন্তু অমন চেহারা হল কেন? মাথার চুলে তেল নেই, মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে....

দাদুর ডাকে সুরুচি এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। ওঁর চোখের দৃষ্টি শিথিল হয়ে আসছে। এখনি চোখ ফেটে জল বেরুতে পারে। কনক এসে বড় বড় চোখ মেলে ওদের দিকে চাইতে চাইতে হালদার-সাহেবের পিছনে এসে দাঁড়াল।

ওরা সুরুচিকে প্রণাম করে দাদুর কথার উত্তরে বললে, এর জন্যেও বোধ হয় আপনারা প্রস্তুত ছিলেন না?

—নিশ্চয়ই না।

—কিন্তু আমরা যে শ্বশুরবাড়ি যাইনি সেতো আপনারা জানতেন দাদুভাই।

দাদু হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললেন, শ্বশুরবাড়ি, উঁ? তোরা আর শ্বশুরবাড়ির কি দেখেছিস?

সে ছিল আমাদের সময়ে। শালীরা কান মলে লাল করে দিত, আর কত রকমের যে ঠাট্টা····

দাদু অট্টহাস্য আরম্ভ করলেন। তাঁর হাসি দেখে স্নুরুচিও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মুখ ফেরালেন।

—গাড়ুর মধ্যে গোবরের জল, বুঝলি? আর পানের মধ্যে আরসোলা, আর····ওকি, লিলি যে! আয় আয়।

লিলি হাসতে হাসতে বললে, আপনার হাসির লহর শুনে এলাম দাদুভাই। তোমরা কখন এলে বিশুদা?

—সেইটেই আসল কথা। আমার হাসির অপবাদ দিসনে। রামেন্দুও এসেছে, তার দিকেও একটু প্রসন্ন দৃষ্টি ঝরুক।

ব্যাপার বেগতিক দেখে স্নুরুচি সরে পড়লেন।

অনেক দিন পরে তরুণ বন্ধুদের পেয়ে হালদারসাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। রামেন্দু ও বিশুর গ্রেপ্তারে তাঁর প্রচণ্ড বাক্যস্রোতের মুখে যেন পাথর চাপা পড়েছিল। কনক-লিলি আসত, কিন্তু তাদের দিক থেকে উৎসাহের অভাব ছিল। তবু তারা দাদুকে মুখর করবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করত না। কিন্তু তাতেও ফল বিশেষ হ'ত না।

তিনি ভাবতেন, ক্রমাগত ভাবতেন। আধুনিক কালকে বোঝবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের কাল থেকে একাল পর্যন্ত যে চিন্তাধারা প্রবাহিত তার গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করবার জন্যে চেষ্টা করতেন। তিনি ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠছিলেন। ইতিমধ্যে এরা ফিরে এসে আবার তাঁর স্বচ্ছন্দ বাক্যধারার সহজ স্রোতটিকে ফিরিয়ে আনলে।

হালদারসাহেব ব'কে চললেন। তাদের কালের বরের দুর্গতি, সেখান থেকে সেকালের সমাজ-ব্যবস্থা এবং কঠোর নিয়ম-কানুনের কথা। কবে নিতান্ত শিশুকালে তাঁর পিতামহের সামনে তাঁর বাবাকে

বাবা ব'লে ডাকায় কী লাঞ্ছনা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। কেন হয়েছিল? তাতে নাকি তাঁর পিতামহের অসম্মান করা হয়েছিল।

অকস্মাৎ এক সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, ওরা তাঁর কথা একেবারেই শুনছে না। ওরা নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে কি যেন কথা বলছে। সে ভাষা তাঁর অজ্ঞাত। সে তাঁদের কালের ভাষা নয়।

তিনি আস্তে আস্তে উঠলেন।

বললেন, তোরা একটু বোস, আমি আসছি।

ওরা শুনলে কি না বোঝা গেল না। শুধু একবার শূন্য দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলে মাত্র।

হালদারসাহেব চলে যাওয়া মাত্র ওরা সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বসল।

কনক বললে, অবস্থা ভালো নয়। তোমরা যে দাদুর বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া কর সে কথা পুলিশ টের পেয়েছে।

—বলিস কি?

—হ্যাঁ। আমাকে এসে দু'বার জিগ্যেস করে গেছে।

—আশ্চর্য! কি করে জানলে?

রামেন্দু ও বিশু পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে।

রামেন্দু একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললে, একটি লোককে অনেক দিন থেকে এ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। এখন বুঝতে পারছি সে কেন ওই রকম করত।

ওরা সমস্বরে বললে, কালো মতন? ছিপছিপে একটা লোক? মাথায় টাক?

—হ্যাঁ। মাথায় টাক আছে।

সবাই গুম হয়ে বসে রইল।

বিশু জিজ্ঞাসা করলে, পুলিশ আর কিছু জিজ্ঞাসা করে নি?

—অনেক কথা। যে প্রোফেসারটির চাকরী গেছে না?

—হ্যাঁ। প্রোফেসার ঘোষ।

—তিনি এখানে আসেন কি না তা' জিগ্যেস করছিল।

ওরা আবার পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে।

—তারপর?

লিলি বললে, আর একটা কথা আমায় জিগ্যেস করেছিল।

ওরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে।

—জিগ্যেস করছিল, পতাকাটা আমার তৈরী কি না। বললে, আর কখনও ওরকম কো'রো না। তোমরা খৃস্টান, তোমরা কেন এ সব স্বদেশীর মধ্যে আস? তোমার কি মক্ষিরাণী হবার সখ হয়েছে?

লিলি মুখ নামিয়ে হাসলে।

—তারপর?

—বললে, তোমরা নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনছ। আমি যেন তার মধ্যে না যাই। আমি বিনীতভাবে বললাম, বেশ। তারপর আমাকে অনেক উপদেশ দিলে। শেষে বললে, তোমরা শীগ্‌গির ছাড়া পাবে। সে সময় যদি আমি তোমাদের ওপর নজর রাখতে পারি,—তোমরা কি করছ, কোথায় যাচ্ছ, কে কে তোমাদের কাছে আসছে, এই সব সন্ধান নিয়ে পুলিশকে জানাতে পারি, তা হ'লে আমার সুখ-সমৃদ্ধি বাড়তে পারে।

সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

—তা হলে আর তোমার ভাবনা নেই।

—না।

একটু পরে লিলি বললে, সে যাই হোক, ব্যাপার সুবিধাজনক নয়। তোমাদের যে বাইরে বেশি দিন থাকতে দেবে তা মনে হয় না।

ওরা চিন্তিতভাবে শুধু বললে, হুঁ।

নিজেদের অজ্ঞাতসারেই একবার চাইলে বাইরের আকাশের দিকে, দূরে ফুলে ভরা শালবনের দিকে। ওদিকের গেরুয়া রঙের ক্রমোচ্চ মাঠে মহুয়ার শাখা লালে-লাল হয়ে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখী বসেছে ডালে ডালে।

আকাশের জন্যে এই তৃষ্ণা তারা জেল থেকে নিয়ে এসেছে। যে ঘরটিতে তারা গত কয়েকদিন কাটিয়েছে তাতে জানলা ছিল না। উপরে কতকগুলি গবাক্ষ ছিল বটে, কিন্তু মেঝেয় দাঁড়িয়ে তার বাইরে দৃষ্টি চলে না। দিনের পর দিন কেটেছে, যে সময়টুকু স্নানাদি কাজের জন্যে তারা বাইরে আসতে পেত, তা ছাড়া আর কোনো সময়ের জন্যে আকাশ দেখতে পেত না। মানুষের মনে আকাশ যে এতখানি জায়গা জুড়ে আছে সেই প্রথম তারা টের পেয়েছিল। তারপর থেকে জেলের কথা মনে হলেই তারা অজ্ঞাতসারেই আকাশের দিকে চায়। জেলের স্মৃতির সঙ্গে আকাশের অভাবের স্মৃতি অদৃশ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

ওদের কেমন মন ডাকছে, জেলের বাইরে বেশি দিন তারা থাকতে আসে নি।

বিশু জেল থেকে ফিরে সটান এখানেই এসেছে। সে উঠে বাড়ি গেল। তাঁরা হয়তো চিন্তিত হয়ে আছেন। কিন্তু ক'দিনের জন্যেই বা তাঁদের নিশ্চিন্ত করতে পারবে সে? সে আর ক'টাই বা দিন? তারপর একদিন সুপ্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দেখবে লাল পাগড়ী এসে বাড়ি ঘেরাও করেছে। তার কয়েক ঘণ্টার পরেই তার গৃহের আরামের মেয়াদ যাবে ফুরিয়ে। আবার সেই নিষ্ঠুর লাল রঙের উঁচু

পাঁচিল, ঘুলঘুলি-ওয়ালা সেই ঘর, সেই সঞ্চরমান বুটের পরিমিত শব্দ। মনুষ্য-সভ্যতার বাইরে সে এক স্বতন্ত্র জগৎ।

কনক গেছে দাদার জন্যে খাবার আনতে। হালদারসাহেব কোথায় গেছেন তিনিই জানেন। লিলি আস্তে আস্তে এসে রামেন্দুর কাঁধের উপর একখানা হাত রাখলে।

রামেন্দু চমকে উঠল।

লিলি জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছিলে?

—ভাবছিলাম? সে অনেক কথা। বিশু চলে গেছে?

—অনেকক্ষণ।

—তুমি যাও নি?

—যেতে বলছ তুমি?

রামেন্দু ওর একখানা হাত ধরে পাশে বসালে। বললে, না, যেতে বলি নি। কিন্তু গেলেই বোধ হয় ভাল করতে।

—কি হত? 'সুখ-সমৃদ্ধি' বাড়ত?

রামেন্দু হাসলে। বললে, না সে ইতরতা তোমার জন্যে কামনা করি না। তবু বোধ হয় ভালোই করতে। কি হবে মিছিমিছি এখানে থেকে?

লিলি চোখ নামিয়ে বললে, তাইত!

কিন্তু রামেন্দু কি ভাবছিল?

গত ছ'টা মাসের মধ্যে তার জীবনে কী আশ্চর্য পরিবর্তনই না ঘটল? ছ'টা মাস আগেও সে দেশের বিশেষ কিছু খোঁজ রাখত না। এমন কি, দৈনিক খবরের কাগজখানা পর্যন্ত উল্‌টে দেখত না। কলেজের

পড়া করত আর খেত। চারিদিকে যা কিছু ঘটত মনের উপর তার অত্যন্ত অস্পষ্ট একটা ছাপ রেখে যেত। কোনোদিন তার গভীরে ডুব দেবার কৌতূহল হয় নি।

তারপর এলেন অধ্যাপক ঘোষ! ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে হল পরিচয়। দেশের সত্যকার রূপের সঙ্গে হল পরিচয়। পরিচয় হল দেশের দুঃখদুর্দশার সঙ্গে, অজ্ঞতা ও অশিক্ষার সঙ্গে, রোগ-শোক ও দারিদ্র্যের সঙ্গে তার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে। তীক্ষ্ণধী অধ্যাপক তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও শাণিত বাক্যের সাহায্যে ভারতের সত্যকার রূপ তাদের মনের মধ্যে দিলেন এঁকে। সে বুঝি আর মুছবে না। এই রামেন্দু,—এত বড় বয়স পর্যন্তও, রাত্রে একলা বাইরে যাওয়ার সাহস যার ছিল না,—বাঘ-ভালুক-শেয়াল, ভূত-প্রেত-দৈত্যদানার ভয়ে যার মন নিদ্রাকালেও ভারাক্রান্ত থাকত, সেও উঠল দুঃসাহসী হয়ে। গৃহের আরাম এবং নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের প্রয়োজন তারও ফুরিয়ে গেল।

রামেন্দুর জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার তার উপায় নেই, ইচ্ছাও নেই।

অথচ আশ্চর্য! তার গৃহবলিভুক্ অতীতের সঙ্গে এই সর্বনাশা বর্তমানের একেবারেই কোনো যোগ খুজে পাওয়া যায় না। এ যেন ঝড়,—দক্ষিণা বায়ুর কোন পরিচয় তার অঙ্গে নেই।

এই সমস্ত কথাই রামেন্দু ভাবছিল। এমন সময় অধ্যাপক ঘোষের আবির্ভাবে সে চমকে উঠল। তাঁর আগমন আকস্মিক এবং সম্প্রতি যে কাণ্ড ঘটে গেল তাতে অপ্রত্যাশিত।

রামেন্দু বিস্মিতভাবে শুধু বললে, স্যার!

—হ্যাঁ, শোন, তোমার বাবা কোথায়?

—পূজোয় বসেছেন।

—এ ঘরে নিরিবিলি কথা বলা যায় ?

—বলুন।

—তোমরা শোন নি বোধ হয়, আমি কালকে চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছেন ? কেন ? গোলমাল তো সব....

—মিটে গেছে। অর্থাৎ আমাকে বরখাস্ত করার যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে। সত্যি। কিন্তু আমি কি এখানে শুধু চাকরী করতেই এসেছিলাম ?

—না।

অধ্যাপক ঘোষ আশ্চর্যভাবে হাসলেন। সে হাসি যেন তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ঝলকে ঝলকে প্রবাহিত হয়ে চোখ, মুখ, ঠোঁট এবং দন্তপংক্তি পর্যন্ত উদ্ভাসিত করে তুলল। রামেন্দু জীবনে কাকেও এমন সুন্দর এবং শোভনভাবে হাসতে দেখে নি।

অধ্যাপক ঘোষ বললেন, যে উদ্দেশ্যে এসেছিলাম তা পূর্ণ হয়েছে। তোমাদের তৈরী করেছি। এখানকার কাজের ভার এখন তোমরাই নিতে পারবে। সে দিক দিয়ে আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। বরখাস্তের গ্লানিও আর নেই। এখন স্বচ্ছন্দেই আমি যেতে পারি। ডাকলেই যাতে আমায় পাও তারও ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। এই কথাটাই বলতে এসেছিলাম। তোমার বাবা পূজো করুন। আমি ততক্ষণ তোমার দাদুর সঙ্গে আলাপ করিগে। যাবার সময় তোমার বাবার হাত ধরেই বেরুতে হবে কি না !

অধ্যাপক আবার সেই আশ্চর্য ভঙ্গীতে হাসলেন।

রামেন্দু জিজ্ঞাসুভাবে চাইলে।

অধ্যাপক বললেন, মোড়ের মাথায় সেই টেকো ভদ্রলোকটিকে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখলাম। তার জানা দরকার যে আমি তোমার কাছে আসি নি, এসেছিলাম তোমার বাবার কাছে।

এই টেকো ভদ্রলোকটিকে রামেন্দু এখন বেশ ভালো করেই চিনে রেখেছে। বাইরে যখনই বেরোয়, দেখে লোকটি পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পান কিনছে, নয় তো বিড়ি ফুঁকছে। অত্যন্ত হতভাগা চেহারার একটি লোক। দেখলে রাগের চেয়ে করুণাই হয় বেশি।

হালদারসাহেব তখন তাঁর নিজের ঘরটিতে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তাঁর পরণে একটি কল্কাদার সিল্কের গাউন এবং ঢিলা পায়জামা। হাতে মোটা চুরুট।

অধ্যাপক দরজার গোড়ায় একটু থমকে দাঁড়ালেন।

মোটা গলায় হালদারসাহেব হাঁকলেন, Never fear, come in, বলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর লোলচর্ম স্থূল বাহু প্রসারিত করলেন।

রামেন্দু পরিচয় করিয়ে দিলে, ইনি প্রোফেসার ঘোষ।

হালদারসাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আপনিই? আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম যে! আমার সাহেবী পোষাক দেখে ভয় পাবেন না। বসুন, Do you smoke?

—না। ধন্যবাদ।

অধ্যাপক ঘোষ বসলেন। সবিস্ময়ে বললেন, আমাকে খুঁজছিলেন কেন বলুন তো?

হালদারসাহেব একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, Professor, I have got to know you. আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার। আপনি দয়া ক'রে....

—তার আগে আপনি দয়া করে আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমার নাম আলোক ঘোষ।

—Good. আলোক তোমাকেই আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। একদিন নয়, অনেক দিন। আমি তোমাদের বুঝতে পারছি না। তার জন্যে বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি জাননা বোধ হয়, আমি দীর্ঘদিন বাংলার সঙ্গে সম্পর্কহীন। এতকাল পরে ফিরে এসে কিছুই চিনতে পারছি না, কাউকে চিনতে পারছি না। নিজের পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাতনী সব অপরিচিত ঠেকছে। এদের মধ্যে থাকতে গেলে এদের তো সব চেনা দরকার।

সার্শির বহুরঙের কাচের ফাঁক দিয়ে বহুরঙের আলো তাঁর মাথায়, ললাটে, মুখে, বুকে এসে পড়ছে। আলোকবাবু অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই হালদারসাহেব সম্বন্ধে অনেক কথাই তাঁর কানে গিয়েছিল, হয়তো অতিরঞ্জিত হয়েই। তবু এমনটি তিনি প্রত্যাশা করেন নি। ওই প্রশান্ত ললাটে, ঋজু নাসিকা এবং দীর্ঘছন্দ মুখের ডৌলে এবং গম্ভীর কণ্ঠস্বরে এমন একটি বুদ্ধির আভিজাত্য আছে, যা মুহূর্তে মানুষকে অভিভূত করে। পর্বতের কাছে গেলে যেমন মানুষের নিজেকে বড ছোট মনে হয়, এঁর কাছে এলেও তেমনি একটি অনুভূতি আসে, অথচ মনে কোথাও গ্লানি জমে না।

হালদারসাহেব আবার বললেন, দেবে তো চিনিয়ে?

তাঁর কণ্ঠে অনুরোধের সুর।

কুণ্ঠিতভাবে আলোকবাবু বললেন, আমি চিনিয়ে দোব? আপনার চোখে কিছুই তো এড়াবার কথা নয়।

—হয়তো নয়। কিন্তু আমারও ত্রুটি আছে। আমি বুদ্ধি দিয়ে তোমাদের জানতে চাইছি। সেইটেই ভুল হচ্ছে, বুদ্ধি দিয়ে কাকেও

পুরোপুরি জানা যায় না। অথচ আমার উনবিংশ শতাব্দীর মন তার পুরোনো সংস্কার নিয়ে কিছুতে তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারছে না। আমার কষ্ট হচ্ছে তাতে।

আলোকবাবু নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগলেন।

হালদারসাহেব হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

বললেন, মুস্কিল কি জানো, শৈলবিহারী মাথায় টিকি রাখেন, সন্ধ্যাহ্নিক করেন, আগে খদ্দরও পরতেন, এখন পরেন না। ওঁদের আমি বুঝতে পারি, কিন্তু ওঁদের সঙ্গে মিলতে পারি না। আর তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারি, কিন্তু বুঝতে পারি না। আশ্চর্য!

আলোক তথাপি চুপ করে রইলেন।

হালদারসাহেব বললেন, আচ্ছা, তোমরা কি চাও বল তো?

—ভারতের মুক্তি।

—মুক্তি? আমরাও চেয়েছিলাম, কিন্তু এমন ক'রে নয়!

—না।

—"বন্দেমাতরম্" আমরাই তোমাদের দিয়েছি, স্বীকার কর?

—কেন করব না?—আলোক হাসলেন।

—কিন্তু তোমাদের এ অন্য "বন্দেমাতরম্", তা স্বীকার কর?

—করি বই কি। কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাকেও স্বীকার করতে হবে, যে মুক্তি আমরা চাই আপনারা তা চাননি। হয়তো আপনাদের কল্পনাতেও তা ছিল না। সর্বমানবের স্বাধীনতা,—চেয়েছিলেন তা? কল্পনা করেছিলেন কি?

চিন্তিতভাবে হালদারসাহেব বললেন, সেটা কি বস্তু? তার মানে গণতন্ত্র তো?

—তারও বেশি। তার মানে শুধু হিন্দুর কিংবা মুসলমানের

স্বাধীনতা নয়, জমিদার কিংবা পুঁজিপতির স্বাধীনতা নয়। অথবা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শাসনও নয়।

—তবে?

—ওই তো বললাম, তা সর্বমানবের স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা শুধু আমাদের রাজনৈতিক মুক্তিই আনবে না, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূর করবে।

হালদারসাহেব নিঃশব্দে অনেকক্ষণ সার্শির দিকে চেয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে বললেন, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না, আলোক। আমি তোমাদের বুঝতে চাই। তোমার কথা আমি ভালো ক'রে ভেবে দেখব। মাঝে মাঝে তুমি আসবে তো?

—অসব। যে ক'দিন আছি।

—তুমি কি কোথাও বাইরে যাচ্ছ?

—ইচ্ছে আছে।

এক মুহূর্ত বাইরের দিকে চেয়ে থেকে হালদারসাহেব বললেন, আমারও ইচ্ছা করে এই বাংলা দেশটাকে একবার ঘুরে ঘুরে ভালো ক'রে দেখে আসি। কিন্তু সাহস পাই না। সে বয়স আর নেই। সে শক্তিও নেই।

রামেন্দু বাইরে থেকে ঘুরে এসে বললে, বাবার আহ্নিক শেষ হয়েছে।

—হয়েছে? আচ্ছা তা হলে....

ব'লে আলোক হালদারসাহেবের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এত শীঘ্র আলোককে ছেড়ে দিতে হালদারসাহেবের ইচ্ছা ছিল না। তেজে, বুদ্ধিতে ও দেশপ্রেমে দীপ্যমান এই তরুণকে তাঁর ভালো লেগেছে। এঁর কাছ থেকে আধুনিক কালের সত্য রূপটির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু আলোক যখন চলে গেলেন, হালদারসাহেব আর তাঁকে ফিরে ডাকলেন না। অতীত কালের কাছে বর্তমানের যে ঋণ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার ক'রে যাবার জন্যেও একবার তাঁকে আসতে হবে, এ বিশ্বাস হালদারসাহেবের আছে।

[১০]

অপরাহ্নে হালদারসাহেব পূর্ব দিকের খোলা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে একখানি ইংরেজি বই পড়ছিলেন। লিলি চুপি চুপি এসে তাঁর পাশের একখানা চেয়ারে বসল।

চশমাটা বাঁ হাত দিয়ে খুলে হালদারসাহেব তার মুখের দিকে সকৌতুকে চাইলেন।

বললেন, কি খবর?

ঠোঁট উলটে লিলি বললে, ভালো নয়।

—কেন?

—বিশ্রী লাগছে।

—সে আবার কি? রামেন্দু কি....

মাথায় ঝাঁকি দিয়ে লিলি বললে, তার জন্যে নয়, আপনার জন্যে।

কৃত্রিম বিস্ময়ে হাঁ ক'রে হালদারসাহেব বললেন, মানে? রামেন্দুর কপাল কি তবে ভাঙল?

—জানি না যান। শুনুন, আপনার কি হয়েছে বলুন তো!

—কিছুই হয়নি তো।

—বাইরে বেরুনো ছেড়ে দিয়েছেন। কবিতা আর বলেন না।

যখনই দেখি, হয় খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ব'সে আছেন, নয়তো ওয়েল্‌স্‌ আর হাক্সলি।

—ওদের মারফৎ তোদের বোঝবার চেষ্টা করছি যে!

ঝাঁঝের সঙ্গে লিলি বললে, বোঝবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ওঁরা আমাদের সম্বন্ধে কি জানেন?

—বলিস কি! ওঁরাই তো আমাদের সম্বন্ধে সমস্ত জানেন।

—কিছু জানেন না। ওঁরা বলবেন, গেল দশ বৎসরে দেশ দু'ইঞ্চি পিছিয়েছে। আগামী দশ বৎসরের আশা করা যাচ্ছে....সব মিথ্যে কথা। এ যেন আবহাওয়া তত্ত্বের নক্সা!

লিলি হাসলে।

ইতিমধ্যে কনক যে কখন হালদারসাহেবের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ টের পায়নি।

সে বললে, তুই কি তবে বলতে চাস, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন পরিবর্তনই হচ্ছে না?

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে অবলীলাক্রমে লিলি বললে, কিছুমাত্র না। পরিবর্তন যা হচ্ছে সে মানুষের বাইরের খোলসের। ভিতরের মানুষটি তেমনি আদিম আছে। তার স্নেহমায়া-ভালোবাসা, তার লোভলালসা-হিংসা, তার নির্লজ্জতা-নিষ্ঠুরতা-কাপুরুষতা, কিছুরই কি বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়েছে?

—কিন্তু....

—কিন্তু নয়। চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লঙ্গ আজও আছে। কেবল তফাৎ এই যে, তারা আজকাল হস্তী-অশ্বে চড়ে আসে না, আসে এরোপ্লেনে চড়ে, মেকানাইজড্‌ বাহিনী নিয়ে। বর্গীর আক্রমণ কালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মৃত শিশু কোলে নিয়ে অসহায় জননী যেমন করে

কেঁদেছে, এই বিংশ শতাব্দীর বিমান আক্রমণকালেও মেয়েরা কি তেমনি করেই কাঁদে না? তফাৎটা কোথায়?

তফাৎ আছে। শুধু রাগ-দ্বেষ-হাসি-কান্না-ভালোবাসা নিয়েই মানুষের সবটা নয়, তার মধ্যেই তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সীমানা নয়। তার বাইরেও অনেকখানি আছে। কিন্তু লিলির হৃদয়-বৃত্তির ঝাপটায় সে দিকটা অন্ধকার হয়ে গেল। কেউ একটা কথাও বলতে পারলে না।

লিলি বলতে লাগল:

—আপনি ইংরিজি পোষাক পরেন, এখনকার বাঙ্গালী নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ছাড়া তা পরে না। কিন্তু নেপালের শৈলশিখরে যেমন করে আপনি হৃদয়-নিবেদন করেছিলেন, একালে কি তার কোনো ব্যতিক্রম হয়েছে মনে করেন?

হালদারসাহেব এতক্ষণে একটা রসিকতা করার কথা খুঁজে পেলেন।

বললেন, সে ভাই তোরা জানিস। আর সাহস দিলে আমিও না হয় একবার অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে পারি।

লিলি হেসে ফেললে।

বললে, ক্ষোভ রেখে কাজ কি? আপনাকে অভয় দিলুম। কিন্তু বেড়ানো কি একেবারেই ছেড়ে দিলেন? আমাদের ছুটি কবে ফুরিয়েছে। শুধু এদের এই সব হাঙ্গামায় যাই-যাই ক'রেও যাওয়া হচ্ছে না।

ওদের দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে হালদারসাহেব দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, সত্যি। ভারি অন্যায় হচ্ছে। চল, আজ বনের ধারে গিয়ে কিছু পরিমাণ সৌন্দর্য শিকার ক'রে আসা যাক।

—চলুন।

পথে চলতে চলতে কনক বললে, এইবার যাওয়ার দিন তো ঘনিয়ে এল। কিন্তু আপনার কি কথা ছিল দাদুভাই?

—কি কথা ছিল মনে পড়ছে না তো?

—এমনিই আপনার মন বটে!

বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে হালদারসাহেব বললেন, সে দুঃখ নিষ্ফল দিদিভাই। কথাটা আর একবার মনে পাড়িয়ে দেওয়া দরকার হয়েছে।

—কলকাতায় বাসা করবার কথা ছিল না?

—ছিল। ঠিক সময়েই মনে পাড়িয়ে দিয়েছিস। Thank you.

লিলি হালদারসাহেবের আঙুলে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, ও, গোপনে-গোপনে এই সব মতলব হচ্ছে! আর আমি বাদ বুঝি?

হালদারসাহেব ওর দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন, তুমিই বা বাদ যাবে কেন দিদি। বাসা হ'লে তুমিও থাকবে, নইলে আনন্দ হবে কেন?

তিনজনে অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ চলতে লাগল।

এক সময় হালদারসাহেব বললেন, তোকে একবার ধন্যবাদ দিয়েছি কনক, না? তাহ'লে থাক। কিন্তু ঠিক সময়ে মনে পাড়িয়ে দিয়েছিস। আমার আর এখানটা ভালো লাগছে না।

—কেন?

—কেন? ঘরের ছেলে জেলে যাচ্ছে। ছেলেদের মাথায় পড়ছে লাঠি। হরতাল, ধর্মঘট, মিছিল। এরই মধ্যে আমি যেন হাঁফিয়ে উঠেছি। নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

বনের মধ্যে একটুখানি খোলা জায়গা। ছোট নদীটির ধারে কতকগুলো পাথর ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। এই জায়গাটা হালদারসাহেবের অত্যন্ত প্রিয়।

বললেন, আয়, এইখানটায় বসা যাক।

নদীর ধারে অর্ধবৃত্তাকারে ওঁরা তিনজনে তিনখানা পাথরের উপর পাশাপাশি বসলেন।

হালদারসাহেব বললেন, একটা বাড়ি ঠিক করবার জন্যে কাকে লেখা যায় বলতো ?

কনক বললে, কোন্‌দিকে বাড়ি নেবেন ?

—যেদিকে একটু ফাঁকা আছে। ভিড় আমি সইতে পারি না। ট্রাম রাস্তা থেকে একটু দূরে হ'লেই ভালো হয়।

লিলি বললে, বালীগঞ্জের দিকে নেবেন ?

মন্দ কি ?

—ওই দিকটাই নিরিবিলি হবে। কিন্তু বড্ড দূর হবে যে! তা ছাড়া ট্রাম থেকে দূরে হ'লে আপনার অসুবিধা হবে না ?

—কিছুমাত্র না। আমার অনেকগুলো টাকা ব্যাঙ্কে পচছে। ভাবছি, মরবার আগে সেগুলোর সদ্গতি ক'রে যাব। ক'লকাতায় গিয়েই একখানা মোটর কিনব।

—মোটর !

কনক ও লিলি উল্লসিত হয়ে উঠল।

শুধু বাড়ি নয়, তার সঙ্গে মোটর! ওরা মোটরে করে কলেজে যাবে, মোটরে ক'রে ফিরবে, মোটরে ক'রে বেড়াতে যাবে! এত বড় সৌভাগ্য যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

বললে, সত্যি দাদু ? মোটর কিনবেন ?

নিশ্চয় !

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হালদারসাহেব বললেন, বিকেলে আমরা তিনজনে যাব বেড়াতে, কখনও লেকে, কখনও গড়ের মাঠে, কখনও বা বাইরে কোথাও! চাঁদিনী রাত্রে ছাদে বসবে আমাদের সভা। একটু

কবিতা পড়া হবে, একটু গান হবে, একটু বা গল্প হবে। বালীগঞ্জের সেই মর্তভূমে আমরা তিনজনে মিলে একটা নতুন স্বর্গ রচনা করব। কি বলিস?

—নিশ্চয়!

একটু পরে লিলি বললে, আচ্ছা দাদুভাই, সেই আলো-ঝলমল ছাদে হঠাৎ যদি আপনার নেপালের সেই প্রিয়া আকাশ থেকে একবিন্দু বৃষ্টির মতো পিছলে নেমে আসে?

—Selene-র মতো? Naked in my arms? আঃ!

হালদারসাহেব যেন শিউরে উঠলেন। আবেশে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এল।

বললেন, স্বর্গটা কিসের তৈরী তোদের কোনো ধারণা আছে?

—না।

—স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। মাটি নয়, জল নয়, পাথর নয়,—শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ পেঁজা তুলোর মতো স্বপ্নের হালকা মেঘ দিয়ে তৈরী। তাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, কিন্তু কল্পনার চোখ দিয়ে দেখা যায়। সেখানে বস্তু নেই, ভার নেই, তাই মৃত্যুও নেই।

—আর দেবতারা?

—তাঁরাও স্বপ্ন। বাস্তবতার অসুর যুগে যুগে তাঁদের স্বর্গভূমি আক্রমণ করেছে। বিজ্ঞান বারে বারে তার মর্যাদা ধূলোয় লুটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফল কি হয়েছে? পরবর্তী অসুরের দল পূর্ববর্তী অসুরদের অতিক্রম ক'রে গেছে। এক যুগের বিজ্ঞান আগের যুগের বিজ্ঞানকে উপহাস করেছে। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির স্রোতরেখা মাঝে মাঝে অন্ধকারে গেছে হারিয়ে। কিন্তু স্বপ্নের স্বর্গ আজও অম্লান, আজও যেমনি দূরে তেমনি দূরে রয়েছে।

কনক বললে, আপনি একদিন দেখবেন, এই স্বর্গও মানুষ একদিন জয় করবে।

হালদারসাহেব বললেন, মানবসভ্যতার জীবনে তত বড় দুর্দিন আমি কল্পনাও করি না। আমি জানি, আমার ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গরচনার আনন্দের অবসান হয়েছে। তোদের শতাব্দী সেই স্বর্গলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এই পৃথিবীর ছোট-ছোট দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। সেখানে নারীমাংসের দুর্গন্ধ, শকুনি-গৃধিনীর কলরব, আর ট্যাঁকে টাকা না থাকার অভিযোগ। তবু স্বর্গ থাকবে এবং এই পৃথিবীর শ্মশানঘাট থেকে মানুষ সেই অদৃশ্যপ্রায় স্বর্গলোকের জন্যেই দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

পাহাড়টার আড়ালে হঠাৎ সূর্য ডুবে যেতেই অন্ধকার নেমে এল। বেশ ভালো লাগলেও আর বসে থাকা চল্‌ল না। ওঁরা তিনজনে বাড়ির দিকে ফিরলেন।

হস্টেলে না থেকে কনক ক'লকাতায় বাসা ক'রে থাকবে, আর সে বাসায় অভিভাবক হয়ে থাকবেন হালদারসাহেব স্বয়ং, এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কি হ'তে পারে। লিলির বাবা একথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে একদিন ধন্যবাদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু শৈলবিহারী এখনও ঠিক মনস্থির ক'রে উঠতে পারেন নি।

তাঁর শুদ্ধাচারিণী জননী শিশুকাল থেকেই তাঁর মন বাপের প্রতি বিমুখ ক'রে দিয়ে গেছেন। সে সময়, বলতে গেলে, তাঁর বাপের সম্বন্ধে তিনি প্রায় কিছুই জানতেন না। আজও যে ম্লেচ্ছাচার ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আর কিছুই জানেন তাও নয়। কিন্তু মায়ের চোখের জল

তিনি দেখেছিলেন। তারপর বাপের সম্বন্ধে আর কিছু জানবার আগ্রহ তাঁর তখনও যেমন ছিল না, এখনও তেমনি নেই। এখনও তিনি সর্বপ্রযত্নে বাপের সংস্পর্শ পরিহার ক'রেই চলেন।

এমনিভাবে একসঙ্গে আরও কিছুদিন থাকলে এমনি পরিহার ক'রে চলাটাই শুধু একটা সংস্কারে হয়তো পর্যবসিত হ'ত। উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধতা বা বিমুখতার বাষ্পমাত্রও থাকত না। কিন্তু এদিকে রামেন্দু কারাবরণ ক'রে পুত্রকন্যার উপর পিতার বিশ্বাসের সূত্র শিথিল ক'রে দিয়েছে। অন্য দিকে নিজের পিতার উপরও তাঁর কোনদিন আস্থা নেই। শৈলবিহারী প্রকাশ্যে কিছু না বললেও মনে মনে কখনও বা চিন্তিত, কখনও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন।

সুরুচি বললেন, তোমার যত মিথ্যা ভয়। বাবার কাছে কনককে রেখে যদি ভয় হয়, তাহ'লে আর কার কাছে রেখে সাহস হবে বলতে পার?

শৈলবিহারী নিরুদ্ধ ক্রোধে শুধু বললেন, হুঁ!

—যে ক'টা দিন বাবা এসেছেন, একদিন তো তাঁর ছায়া মাড়ালে না। তুমি কি ক'রে জানবে তিনি কত বড় মানুষ!

—হুঁঃ!

—ছেলেমেয়ে দুটোকে কি ভালো যে তিনি বাসেন, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কতকটা তো ওঁর গলার হার বললেই হয়। তবু কেন যে তুমি....

শৈলবিহারী এবারে যেন নেকড়ে বাঘের মতো খ্যাঁক্ ক'রে উঠলেন।

—কেন যে আমি আপত্তি করি সে তুমি কি ক'রে জানবে? তুমি তো আর আমার মায়ের হাতে মানুষ হও নি।

—ভাগ্যিস হই নি! তিনি গুরুজন, তাঁকে অসম্মান করছি না, কিন্তু তুমি অতি বড় অনাচার করলেও তোমাকে আমি ত্যাগ করতে পারতাম না। তোমার উপরে তোমার ছেলেমেয়েদের মনও আমি এমন ক'রে বিষিয়ে তুলতাম না। তুমি যাই বল, কাজটা তিনি ভালো করেন নি।

শৈলবিহারী তেমনি ক'রে আবার বললেন, হুঁঃ!

সুরুচি শান্তকণ্ঠে বললেন, আর অনাচারের কথা বলবে? তোমার ছেলেই কি টিকি রেখেছে, না সন্ধ্যাহ্নিক করে?

—ছেলের তো কথা নয়, মেয়ের।

—মেয়ের? তোমার মেয়ে কলেজে পড়ছে। লিলির সঙ্গে দিনরাত ঘুরছে, তাদের বাড়ি যাচ্ছে, ফিরে এসে কাপড়ও ছাড়ছে না, কিছু না। তারই বা কিসের আচার-বিচার?

—মা থাকলে এরকম হ'ত না। তোমার জন্যেই এরকমটা হ'তে পেরেছে।

—বেশ, তাই যেন মানলাম। কিন্তু মা যখন নেই, মেয়েটার যে রকম হওয়ার কথা তা যখন হ'লই না, তখন বাবার সঙ্গে তাকে কলকাতার বাসায় রাখতে আর আপত্তিটা কি?

—হুঁ!

কিন্তু অতি সহজে সুরুচি তাকে নিষ্কৃতি দিলেন না। শেষ পর্যন্ত শৈলবিহারীকে বিরক্ত হয়েও বলতে হ'ল—আমাকে কিছু জিগ্যেস কোরো না। তোমরা যা ভালো বোঝ কর।

অবশেষে কনকের হালদারসাহেবের সঙ্গে যাওয়ার ব্যবস্থাই হ'ল।

কলকাতা এসে প্রথম পোনেরোটা দিন ওদের নাইবার-খাবার সময় রইল না। ওদের পাম এভিনিউ-এর বাড়িখানি সুন্দর হয়েছে। ছোট বাড়ি, কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যবস্থা আধুনিক। এবং সামনেটা একেবারে চাপা নয়, একটুখানি লনও আছে।

কিন্তু বাড়ি যত ছোট, তাকে সাজাবার হাঙ্গামা তত ছোট নয়। রেডিও নেওয়া হয়েছে। মোটরখানিও চমৎকার হয়েছে। এখন নানা রকমের ক্যাটলগ মিলিয়ে ফার্নিচার কেনা হচ্ছে। লিলির একটি আত্মীয় যুবক জ্ঞানেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এই দুঃসাধ্য ব্যাপারে এই দুটি অনভিজ্ঞা তরুণীকে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। লিলির অনুরোধ মত এই বাড়িখানাও সে-ই ঠিক ক'রে দিয়েছে।

বলা বাহুল্য, জ্ঞানেন্দ্র ছেলেটি ভালো। নইলে কখনই এমনি দুটি অব্যবস্থিতচিত্তা তরুণীকে নিয়ে এ-দোকান থেকে ও-দোকান, একবারের জায়গায় বিশবার ঘোরাঘুরি করতে সম্মত হ'ত না। এই শ্রম স্বীকারের জন্যে হালদারসাহেব কিংবা কনক তাকে ধন্যবাদ দিতে গেলেও বেচারা কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ত।

এবারে এম-এ পাস ক'রে বেচারা বিপদে প'ড়ে গেছে। তার বাপ-মায়ের ইচ্ছা সে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেয়, অন্ততপক্ষে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারীটা পাস ক'রে আসে। বিলেত যাওয়ার ইচ্ছা তারও আছে। কিন্তু ব্যারিস্টারী পাস করতে নয়। সে অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসে এখানে প্রোফেসারী করতে চায়। এই নিয়ে অকারণে যে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, হালদারসাহেবদের সংসর্গে এসে তা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে বেঁচেছে। সেই জন্যে সে নিজেই সব সময়

কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হ'য়ে থাকে। তাকে ফরমাইস করলেই সে কৃতার্থ হয় এবং কোন কথা বলবার আগেই নুয়ে পড়ে।

তার নিজের একখানা টু-সীটার গাড়ি আছে। এতদিন সেখানার আর বিশ্রাম ছিল না। হালদারসাহেব নতুন গাড়িখানা কেনার পর থেকে সে বেচারা বিশ্রাম পেয়ে বেঁচেছে। সেই সঙ্গে হালদারসাহেবের শোফারটারও অনেকখানি শ্রমলাঘব হয়েছে। কারণ বিকেলে বেড়াবার সময় অধিকাংশ দিনই গাড়ি চালায় জ্ঞানেন্দ্র স্বয়ং।

হালদারসাহেব সংকল্প করেছিলেন, কলকাতার বাসায় তাঁরা তিনজনে মিলে স্বর্গ রচনা করবেন। দৈবক্রমে তাতে আরও একজনের অপ্রত্যাশিত-রূপে আবির্ভাব হয়েছে। তাতে অবশ্য স্বর্গ রচনার কোনো ব্যাঘাত হয় নি। এবং হালদারসাহেব অথবা কনক-লিলি কেউ-ই এই চতুর্থ ব্যক্তিকে উপসর্গ ব'লে মনে করেন নি। বিকেলে সকলকে নিয়ে সে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াতে যায়। রাত্রে চন্দ্রালোকিত ছাদে হালদারসাহেবের মুখ থেকে কবিতা শোনে। নিজেও সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। কখনও কখনও নিজেও কবিতা শোনায় এবং আলোচনায় যোগ দেয়। জ্ঞানেন্দ্র সানন্দে ওদের স্বর্গ রচনায় অংশ গ্রহণ করেছে। হালদারসাহেবও তার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন।

কি একটা পর্বোপলক্ষে সেদিন কনক ও লিলির ছুটি, কলেজ ছিল না। হালদারসাহেব দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম থেকে উঠে তাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে নীচের পড়বার ঘরে একা ব'সে কি একখানা বই পড়ছিলেন।

মোটরের শব্দে বই থেকে চোখ তুলে দেখেন, ওরা তিনজনে ফিরছে।

তিনজনেরই মুখ রক্তবর্ণ। ঘন ঘন রুমালে ঘাম মুছছে। মাথার চুল অবিন্যস্ত।

হালদারসাহেব সবিস্ময়ে বললেন, কি ব্যাপার! এত রোদ্দুরে কোথায় বেরিয়েছিলি!

কনক তখনও হাঁফাচ্ছে। পাশের একটা সেত্তিতে সে যেন ভেঙে পড়ল। জ্ঞানেন্দ্র ব্যস্তভাবে পাখার রেগুলেটার খুঁজছে।

লিলি কোন রকমে বললে, ভীষণ একটা এ্যাডভেঞ্চার দাদুভাই। উঃ কী থ্রিল!

হালদারসাহেব সন্দিগ্ধভাবে ওদের তিনজনের দিকে পর্যায়ক্রমে চাইলেন। সভয়ে বললেন প্রেম-ট্রেম নয় তো?

লিলি অপাঙ্গে একবার কনকের এলায়িত দেহের দিকে দ্রুত চেয়ে নিয়ে শুধু বললে, নাঃ!

—কী তবে?

ক্লান্তভাবে হেসে কনক বললে, মিঃ মুখার্জির কাছে মোটর ড্রাইভিং শিখছি, দাদুভাই।

আশ্বস্তভাবে হালদারসাহেব বললেন, তাই বল্। শিখলি কিছু? না রোদে ঘোরাই সার?

জ্ঞানেন্দ্র রেগুলেটারটা বাড়িয়ে কেবল ব'সে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বললে, অনেকখানি। বোধ করি, সাত দিনের বেশি লাগবে না। ওরা দু'জনেই এমন Intelligent, আর এত smart!

—হুঁঃ?

হালদারসাহেব হাসি চাপবার জন্যে একটা চুরুট ধরালেন।

জ্ঞানেন্দ্র খোঁচাটা ধরতে পারলে না। গম্ভীরভাবে বললে, সাত দিনের মধ্যে আপনাকে নিয়ে ওরা মোটরে বেড়াতে পারবে।

—না, না ! বুড়ো মানুষের উপর দিয়ে হাত পাকান কেন ভাই ? ওদের হাতে আত্মসমর্পণ করার মতো আনাড়ি আমি নই।

ঠোঁট উল্‌টে কনক বললে, আমরাও প্রথম চোটেই বুড়ো মেরে খুনের দায়ে পড়তে রাজি নই।

—Good. আগে তাজা ছোকরাদের মেরে হাত পাকাও, তারপরে আমি তো 'হাতের পাঁচ' আছিই ! কি বল জ্ঞান ?

হালদারসাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

জ্ঞানেন্দ্র অতি নিরীহ লোক। বেশি মারপ্যাঁচ বোঝে না। সরল-ভাবে বললে, নিশ্চয়।

সঙ্গে সঙ্গে আর একবার হাসির রোল পড়ে গেল, আর জ্ঞানেন্দ্র অপ্রস্তুতভাবে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, কি হ'ল ? আমি কি কিছু বেফাঁস বলেছি ? কি জানি, আমি আপনার কথাটা ঠিক শুনিনি মিঃ হালদার। আমার স্বভাবটাই এত অন্যমনস্ক ধরণের যে....

নিজের রিস্টওয়াচের দিকে চেয়ে কনক হঠাৎ লাফিয়ে উঠল।

—আপনার চা খাওয়া তো হয় নি দাদুভাই !

—কি ক'রে হবে ?

—কি সর্বনাশ !

কনক ঊর্ধ্বশ্বাসে উপরে ছুটতে যাবে, জ্ঞানেন্দ্র সুমুখে এসে দাঁড়াল।

সবিনয়ে বললে, আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি মিস্ হালদার ?

—আসুন।

ওরা চলে গেলে হালদারসাহেব লিলির দিকে চেয়ে বললেন, কি ব্যাপার বল তো ?

—কিসের ?

চোখের ইঙ্গিতে উপরটা দেখিয়ে বললেন, ওদের। প্রেম নয় তো? বড় বেশি obliging মনে হচ্ছে যেন।

লিলি খিল খিল করে হেসে উঠল:

—দাদু যেন কি! ইয়ং ম্যান একটু obliging হবে না?

—তার মানে ভয় নেই তো?

—তা আমি কি ক'রে জানব?

লিলি আবার তেমনি ক'রে হেসে উঠল।

—ওই তো। তোদের ওই হাসিটাই বড় সর্বনেশে। ওকেই আমার ভয়।

লিলি হঠাৎ বললে, চুপ করুন। ওরা আসছে।

সিঁড়িতে ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে হালদারসাহেব চুপ করলেন।

সন্ধ্যায় ছাদের সভায় পূর্বদিনের আলোচনার জের টেনে জ্ঞানেন্দ্র বললে, আপনি কালকে শেলীর সম্বন্ধে যে কথাটা বলছিলেন মিঃ হালদার।

—ও শেলী! Shelly is dead. Long live Shelly! আমাকে তোমাদের post-war কবিতা কিছু শোনাও।

জ্ঞানেন্দ্র হাত কচলে বললে, এইবারেই মুস্কিল করলেন মিঃ হালদার। প্রথমতঃ, ইংরিজি post-war কবিতা আমার খুব বেশি পড়া নেই। দ্বিতীয়তঃ, তার অনুকরণে রচিত বাঙলায় অতি আধুনিক নামে পরিচিত যে কবিতাবলী পড়ি, তা পড়াই চলে, তা নিয়ে আলোচনা করা চলে না। ব্যক্তিগতভাবে সেই আয়নায় যখন আমি আমার কালের এবং আমার কালের সভ্যতার ছবি দেখি, সত্যি বলতে কি, তখন বড় লজ্জিত হই।

হালদারসাহেব বললেন, কিন্তু সেই যদি তোমার কালের মানুষের

এবং তোমাদের সংস্কৃতির সত্যিকার রূপ হয়, তা'হলে লজ্জিত হতে পার, কিন্তু অভিযোগের কি আছে ?

জ্ঞানেন্দ্র একটু ভেবে বললে, গত মহাযুদ্ধ ওদের নীতিবোধ, ওদের সমাজবুদ্ধিকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে, সে আমি অস্বীকার করি না। কিছুটা অনুকরণের কল্যাণে, কিছুটা যুগধর্মের প্রয়োজনে তার দু'একটা তরঙ্গ আমাদের দেশেও এসে পৌঁছেচে সন্দেহ নেই। তার ধাক্কায় আমাদের সমাজবুদ্ধি টলমল ক'রে উঠেছে সত্যি। কিন্তু নারীমাংসের লোভে আমরা শকুনের মতো উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি, এ আমাদের সত্যিরূপ নয় মিঃ হালদার।

হালদারসাহেব কৌতুকের সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রের কথা শুনতে লাগলেন।

কনক হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললে। বললে কিন্তু রাস্তায় যখন বেরুই মিঃ মুখার্জি, তখন মনে হয় না, কবি এতটুকু মিথ্যে বললেন। রাস্তার দুই ফুটপাথ শকুনের মতোই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

জ্ঞানেন্দ্র তাড়াতাড়ি বললে, মাফ করবেন মিস হালদার। আমার কথা ঠিক ও নয়। নারীর রূপ, নারীর দেহ-সুষমার প্রতি পুরুষের লোভ সর্বকালের। সে লোভ অশোভন হ'তে পারে কিন্তু অস্বাভাবিক নয় এবং তা মৃতমাংসের উপর শকুনের লোভের মতো বীভৎস তো নয়ই।

লিলি বললে, তোমার কথাটা এখনও বেশ পরিষ্কার হ'ল না জ্ঞান'দা। শকুনের যে লোভ, তাকেও তো তুমি অস্বাভাবিক বলতে পার না। সেও স্বাভাবিক।

জ্ঞানেন্দ্র প্রত্যুত্তরে বললে, শকুনের পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষের পক্ষে নয়। শকুনের লালসায় নারীর মৃতদেহ বিগলিত হ'তে পারে, কিন্তু জীবিত নারী আঁৎকে ওঠে।

—আঁৎকে ওঠার কথা নয়,—কনক বললে, আঁৎকে ওঠার কথা নয়।

আমি বলছিলাম, শকুনের লালসাও মানুষের মধ্যে আছে। তাও মিথ্যে নয়।

—সত্যিও নয়। মানুষের মধ্যে পশু আছে। কিন্তু সেই তার পরিচয় নয়। আমাদের সংস্কৃতির যে সৌধ সেও সেই পশুপ্রবৃত্তির সমাধির উপরের তাজমহল ছাড়া আর কিছুই নয়।

—কিন্তু পথে চলতে....

জ্ঞানেন্দ্র বাধা দিয়ে বললে, পথে চলতে যাদের দেখেন, কোথাও কোথাও হয়তো তারা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। আপনাদের রূপ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জীবতত্ত্বের নিয়মে অজ্ঞাতসারেই তাদের চোখকে আকর্ষণ করে। তারা চেয়ে দেখে, চেয়ে দেখবে কিন্তু কোনদিন আপনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না। এইখানেই সে মানুষ।

ওর রাগ দেখে কনক, লিলি এবং হালদারসাহেব তিনজনেই কৌতুক বোধ করছিলেন।

কনক টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললে, বিশ্বাস কি?

—বিশ্বাস আছে। না থাকলে যত পুলিশ পাহারাই থাক, আপনারা কিছুতে পথে বেরুতে সাহস করতেন না।

লিলি বললে, কিন্তু তুমি কি বলতে চাও ক'লকাতার রাজপথে সে রকম কাণ্ড একেবারেই ঘটে না?

—ক্বচিৎ। তাতে স্বাভাবিক নিয়মটাই প্রমাণিত হয়।

হালদারসাহেব সজোরে বললেন, Exactly.

জ্ঞানেন্দ্র উৎসাহিত হয়ে বললে, আপনি সেই কবিতাটি পড়েন নি মিঃ হালদার, সে আমি বলতেও পারব না।

হালদারসাহেব অম্লানবদনে বললেন, সেই শকুনির কবিতা তো?

যাতে কবি প্রিয়ার উরুদেশে ব'সে শকুনের মতো মাংস ঠুকরে খাবার সদিচ্ছা ঘোষণা করেছেন? পড়িছি তো।

কনক এবং লিলি হাসি চাপবার জন্যে মুখ ফিরিয়ে নিলে। জ্ঞানেন্দ্র লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

কিন্তু হালদারসাহেব কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে বলতে লাগলেন, দেখ ভাই, এই উনবিংশ শতাব্দীর বুড়োর কথা তোমাদের যুগে চলবে কি না জানি না। আমার কিন্তু বিশ্বাস আছে, মাঝের এই ক'টা বছর নতুনত্বের নাম ক'রে শকুনি-গৃধিনী যতই ঘুলিয়ে দিক, নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে এই কথাই টিকবে যে:

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

এ ভাবালুতা নয়; এ সত্যি। একে যারা trash ব'লে উড়িয়ে দেবে তারাই ঠকবে।

[১২]

সুরুচি আশা করেছিলেন, হালদারসাহেব চলে যাবার পরে শৈলবিহারী হয় তো শান্ত হবেন। যে ক'টা দিন হালদারসাহেব ছিলেন একটা দিনও শৈলবিহারী খুশি ছিলেন না। তাঁর মুখ আষাঢ়ের মেঘের মত সব সময় ভারাক্রান্ত থাকত। একদিন হাসেন নি, একদিন কারো সঙ্গে ভালো ক'রে কথা বলেন নি। সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে মানুষ যেমন সব সময় শশব্যস্ত থাকে, তেমনি ক'রে তিনি সব সময় যেন চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন থাকতেন।

হালদারসাহেবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এই আবহাওয়া সুরুচির পক্ষেও প্রীতিকর ছিল না। হালদারসাহেব চলে যেতে তিনি খুবই মুসড়ে পড়লেন সত্য। হাতে কাজ আর বলতে গেলে রইলই না। তবু এই ভেবে তিনি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলেন যে, হালদারসাহেব তো এখানকার লোক নন। ধূমকেতুর মতো একদিন যেমন হঠাৎ তিনি এসেছিলেন, আবার একদিন তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে কনক আর লিলি। সুতরাং তার জন্যে চিন্তা করবার কিছু নেই। এখন তিনি চলে যাওয়ায় যদি শৈলবিহারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন, সেইটেই পরম লাভ।

শৈলবিহারীর অবশ্য সম্পূর্ণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার কারণ ছিল না। হালদারসাহেব এখান থেকে গেছেন বটে, কিন্তু কনককে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। তাকে যে তিনি কি ক'রে তৈরী করবেন ভগবান জানেন। কিন্তু শৈলবিহারীও আর অত ভাবতে পারেন না। রামেন্দুকে নিয়েই ভয় বেশি। সে তো তাঁর চোখের সম্মুখেই রইল। 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে' তিনি পণ্ডিত মানুষের মতো অর্ধেক ত্যাগ করলেন।

হালদারসাহেব চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমস্ত ঘর নতুন ক'রে চুণকাম করলেন। বাইরের বারান্দা থেকে অন্দরের উঠান পর্যন্ত গঙ্গা-জলে ধৌত করলেন। অনাচারের পাপ যদি তাতেই ধুয়ে যায়! সন্ধ্যার সময় মায়ের বড় অয়েল পেন্টিং ছবি ফুলের মালায় সাজিয়ে, ঘরে ধূপ-ধুনা দিয়ে তিনি রামেন্দুকে নিয়ে উপাসনাতেও বসলেন। তারপর সমস্ত ঘরে স্বচ্ছন্দে বিচরণ ক'রে আবার আগের মতো সমস্ত দেখাশোনা করতে লাগলেন।

সুরুচি এ সমস্ত দেখেও দেখলেন না। এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কলহ করার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। যে ক'মাস হালদারসাহেব এখানে ছিলেন,

স্বামীর সঙ্গে অনেক কলহ তিনি করেছেন। তার তিক্ততা এখনও তাঁর মনের মধ্যে জমা আছে। কিন্তু তিনি ক্লান্ত।

বিশেষ হালদারসাহেব চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকের ভিতরের একটা বড় অংশ যেন খালি হ'য়ে গেছে। রামেন্দু আছে, কনক আছে, কিন্তু এই একান্ত অসহায় বৃদ্ধ শিশুর 'ছোটমা' ডাক যেন তাঁকে এক অনির্বচনীয় নতুন মাতৃত্বে অভিষিক্ত করেছে, যার স্বাদ তিনি কিছুতে ভুলতে পারছেন না। হালদারসাহেবের খাওয়া-শোওয়া নিয়ে তাঁর বিশ্রাম ছিল না। তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যেন মস্ত লম্বা ছুটি মিলে গেছে। তাঁর বুকের ভিতরটা সব সময় হু হু করছে।

তবু তিনি কথাটি ক'ন না; সে শুধু স্বামীর কথা ভেবে। হালদার-সাহেবের অনাচার, তাঁর চিন্তার উচ্ছৃঙ্খলতা শৈলবিহারী সহ্য করতে পারছিলেন না। মায়ের দুঃখ ও বেদনায় তাঁর মন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ভিতরে ভিতরে তিনি উত্তপ্ত হচ্ছিলেন। অথচ একটা কথাও বলতে পারছিলেন না। সেই কথা ভেবেই তিনি নিঃশব্দে রইলেন। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হালদারসাহেব যেন একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়েছিলেন, পরস্পরকে পরস্পরের কাছ থেকে আড়াল করে। তাঁদের মধ্যে একটা অবাঞ্ছনীয় ব্যবধান গড়ে উঠছিল।

সত্যই। পিছন দিকে চেয়ে স্থরুচি দেখেন, এই ক'মাসেই তিনি কার্যে, চিন্তায় স্বামীর কাছ থেকে অনেকখানি স'রে এসেছেন। আরও কিছু দিন হালদারসাহেব থাকলে তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্ক কোথায় গিয়ে পৌঁছুত, ভাবতেও তিনি শিউরে উঠলেন।

তার চেয়ে এ ভালোই হয়েছে যে, হালদারসাহেব গেছেন। কনক আছে, লিলি আছে। তারা ওঁকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে। ওঁর এতটুকু অস্থবিধা সেখানে হবে না। মধ্যে থেকে স্থরুচি একটা

অবাঞ্ছনীয় অবস্থার হাত থেকে পেলেন রেহাই। শৈলবিহারী প্রকৃতিস্থ হবেন। তাঁর ছোট সংসারে আবার শান্তি ফিরে আসবে।

চোখের জল মুছে সুরুচি আপন মনেই বারবার বলতে লাগলেন, এ ভালোই হ'ল তিনি গেছেন, এ ভালোই হ'ল।

দিন কয়েক পরে শৈলবিহারী কলেজ থেকে ফিরে সুরুচির দিকে একখানা চিঠি ছুঁড়ে দিলেন।

চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে সুরুচি জিজ্ঞাসা করলেন, কার চিঠি?

পোষাক খুলতে খুলতে শৈলবিহারী উদাসীন ভাবে বললেন, কনকের।

চিঠিখানা পড়ে সুরুচি হেসে ফেললেন। বললেন, এরই মধ্যে গাড়ি কেনাও হয়ে গিয়েছে!

—হুঁ।

—বাবার কিছু টাকাও বোধ হয় আছে।

—কিছু নয়, বেশ মোটা টাকাই। একা লোক, যা পেয়েছেন সবই তো জমেছে।

—মেয়ে দুটোর পাল্লায় পড়ে সে টাকার এত দিনে বোধ হয় সদ্গতি হবে।

শৈলবিহারী জবাব দিলেন না।

সুরুচি হেসে বললেন, বেশ আছে!

চা খেতে খেতে শৈলবিহারী বললেন, এমনি ভয়ই আমি করছিলাম। তুমি বলবে, আমি বাবার ওপর খুশি নই। কেন নই সে কথা বুঝবে না। এই জন্যেই খুশি নই।

—কি জন্যে ?

—এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে।

—মোটর কেনা কি উচ্ছৃঙ্খলতা ?

—ওঁর পক্ষে নয়, কিন্তু মেয়েটার পক্ষে ?

—মেয়েটার পক্ষেই বা কেন ? কলকাতা শহরে মোটরে করে কি মেয়েরা কলেজে যায় না ?

শৈলবিহারী চুপ করে রইলেন। তিনিও সুরুচিকে অনেক দিন পরে কাছে পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কলহ করতে আর তাঁর ইচ্ছা হয় না। তবু একেবারে চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না।

ধীরে ধীরে বললেন, তুমি কি ভাবছ, ব্যাপারটা শুধুই একটা মোটর কেনা ?

—তা ছাড়া আর কি, বল ?

—দিন রাত্তির এই মোটর নিয়ে ওরা হৈ হৈ করে বেড়াবে, এই আমি তোমায় বলে দিলাম।

—হৈ হৈ করে বেড়ানোটা কি ?

—সে যে কি, কলকাতার উচ্ছৃঙ্খল মেয়েদের না দেখলে বুঝবে না। আমার সাধ্যি নেই বোঝাই।

সুরুচি আর উত্তর দিলেন না।

শৈলবিহারী বললেন, পড়াশোনা চুলোয় যাবে যাক। মেয়েছেলে ওই যা শিখেছে যথেষ্ট। আমি ভাবছি ওর পরকালের কথা।

—তুমি আর ভেবে কি করবে ?

—কিছুই করতে পারব না। এই জন্যই আমার ইচ্ছা ছিল না, বাবার সঙ্গে ওকে পাঠাই। শুধু তুমিই....

কথা বাড়াবার ভয়ে সুরুচি উঠে চলে গেলেন।

শৈলবিহারী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে আবার ডাকলেন, শুনছ?

—কি বল?

সুরুচি ফিরে এলেন।

শৈলবিহারী বললেন, ভাবছি, কনকের বিয়ের ব্যবস্থা করা যাক। বসন্তর ছেলেটি শুনেছি ভালো। বছর দুই হ'ল ল' পাস করেছে। একটা মুন্সেফি পেতে পারে।

বিবাহের সম্বন্ধে সুরুচির আপত্তি ছিল না।

বললেন, বেশ তো।

—তাহ'লে কাল একখানা চিঠি লিখব নাকি?

—লেখ।

—একবার যেতেও হয়।

—আমিও তাই বলি। চিঠির কি উত্তর আসে দেখ। তার পরে একটা ছুটি দেখে মজঃফরপুর থেকে ঘুরে এস।

—সেই ভালো।

—তার আগে··· আচ্ছা তুমি ঘুরেই এস তো।

শৈলবিহারী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

বললেন, সে তো আসব। কিন্তু তার আগে কি বলছিলে?

একটা ঢোক গিলে সুরুচি বললেন, কিছুই নয়। বলছিলাম, মেয়েও বড় হয়েছে।

—সেই জন্যই তো তাড়াতাড়ি করছিলাম। তুমিই তো মেয়েকে কলেজে পড়াতে চাইলে। নইলে কোন্ দিন বিয়ে হয়ে যেত। আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল ন'বছর বয়সে। তোমার বিয়ে হ'য়েছিল তেরো বছরে। আর মেয়ের বয়স হ'তে চলল আঠারো-উনিশ। এ আমি পছন্দ করি না।

সুরুচি হেসে বললেন, তা তো কর না। কিন্তু যে কালের যা। তবে মেয়ে বড় হয়েছে। আমি বলছিলাম।....

—কি ?

—বড় মেয়ে। একবার তারও মতটা নেওয়া উচিত।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে শৈলবিহারী বললেন, কী আবোল-তাবোল বকছ ? কনকেরও মত নিতে হবে ?

নম্রকণ্ঠে সুরুচি বললেন, নেওয়া উচিত। তা সে তোমাকে কিছু করতে হবে না। যা করবার আমিই করব। তুমি এর মধ্যে একবার মজঃফরপুর থেকে ঘুরে তো এস।

শৈলবিহারী সোজা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, সব তুমিই কর। আমি এর মধ্যে নেই। কনকের অনুমতি নিয়ে তবে তার বিয়েতে দাঁড়াব, সে বাপ আমি নই। তাহ'লে তোমরা যা জান, তাই কর। আমি তখনই বলেছিলাম....

রাগে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে শৈলবিহারী বেরিয়ে গেলেন।

শৈলবিহারী চলে গেলে সুরুচি একা স্তব্ধভাবে বসে রইলেন। স্বামীর এই ক্রোধ তাঁর নিতান্ত অসঙ্গত বলে মনে হল না।

সত্যিই। যুগ অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

শাশুড়ীর বিয়ের কথা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু তাঁর নিজের বিয়ে তো খুব বেশী দিনের কথা নয়। তিনি তো ভাবতেই পারেন না যে, সেদিন তাঁর বিয়েতে কারও কাছে তাঁর মতামতের আবশ্যক ছিল। বরং তাঁর মনে পড়ে, কোথাও তাঁর বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে বাঁচতেন। আড়াল থেকে দু'একটা কথা শোনবার

ইচ্ছা খুবই হ'ত। কিন্তু কেউ তাঁর আড়িপাতা দেখে ফেললে লজ্জার আর শেষ থাকবে না বলে সে সাহসও হ'ত না।

আর আজ তাঁরই নিজের মেয়ের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে!

কী ভীষণ পরিবর্তন!

সুরুচি যখন এইসব কথা ভাবছেন, তখন রামেন্দু শুষ্কমুখে তাঁর কাছে এসে বসল।

—কি রে, চুপ ক'রে এসে বসলি যে?

—বসলাম!

সুরুচি সহাস্যে বললেন, তারপরে? টাকা?

লজ্জিতভাবে রামেন্দু বললে, টাকার দরকার না থাকলে বুঝি তোমার কাছে এসে বসি না?

—তাই তো জানতাম। বলে ফ্যাল্ বাপু, আমার আবার অন্য কাজ আছে।

—যাও না কাজে। আমি কি নিষেধ করছি?

সুরুচি তথাপি বসে রইলেন।

তারপর বললেন, কনকের চিঠি এসেছে।

—কি লিখছে? দাদু ভাল আছেন?

—হ্যাঁ। বাবা একখানা মোটর কিনেছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—Three cheers for Dadu! কি আরামেই আছে ওরা! আমার কিন্তু হিংসে হচ্ছে, মা।

সুরুচি হেসে বললেন, তোমারও আর এই বছরটা। তারপরে যদি পাস ক'রতে পার, তখন তো কলকাতায় ওদেরই সঙ্গে থাকবে।

কিন্তু এই একটা বছরই কি কম দিন, মা! পূজোর ছুটিতে যাব তারও উপায় নেই। সামনেই একজামিন। কিন্তু মোটর ড্রাইভিংটা আমাকে শিখতেই হবে।

—বেশ তো!

কিন্তু মোটর ড্রাইভিং যতই লোভনীয় হোক, সম্প্রতি যে তারও চেয়ে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। আজ রাত্রে খুণ্টা পাহাড়ের নীচে তাদের পার্টি-মিটিং। একটার আগে যে ফিরতে পারবে সে ভরসা কম। অথচ শৈলবিহারী আজকাল তার গতিবিধি সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক। তাঁর চোখে ধূলো দিয়ে এতক্ষণ বাইরে থাকা অসম্ভব।

রামেন্দু ডাকলে, মা!

সুরুচি হেসে ফেললেন। বললেন, কি বলবি বল না বাপু। আমি তোরই জন্যে চুপ করে ব'সে।

—আজকে আমার ফিরতে একটু রাত্তির হবে মা।

—কেন?

—আমি আর বিশু শহরে একটি ছেলের বাড়ি পড়া করতে যাব।

—কেন, বাড়িতে পড়া হয় না?

—আমার সে বই নেই।

সুরুচি গম্ভীরভাবে বললেন, সে সব কথা ওঁকে বলগে বাপু। আমি ও-সব বুঝি না।

—ওরে বাবা! ওঁকে বললে, হাজার কৈফিয়তে পড়ব মা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আজকের মতো ছেড়ে দাও। আর কোনো দিন যদি ছুটি চাই তখন বোলো। সত্যি বলছি, নইলে আমার পড়ার ক্ষতি হবে।

সুরুচি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর

বললেন, নিজের ভালোমন্দ বোঝবার বয়স তোমার হয়েছে। আমি আর কি বলব বল। কিন্তু বেশি রাত্তির ক'রো না যেন।

—না মা। পড়া হয়ে যাবে আর চলে আসব, বড় জোর একটা।

—একটা!

রামেন্দু কাকুতির সঙ্গে বললে, একটা হবে বই কি মা! পরীক্ষার পড়া! এখান থেকে যাবই তো আটটার সময়।

—তাই এস। তার বেশি যেন দেরী কোরো না। তাহ'লে কিন্তু আমি সামলাতে পারব না।

—না মা, তুমি দেখো।

রামেন্দু লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু শৈলবিহারী সত্যই অত্যন্ত সতর্ক হয়েছেন। দশটার সময় তিনি সুরুচিকে জিজ্ঞাসা করলেন, রামেন্দু কোথায়?

সুরুচির মিথ্যা কথা বলার অভিপ্রায় ছিল না। রামেন্দু সত্যই যে কোনো অপরাধ করেছে সে কথাও তাঁর মনে হয় নি। বন্ধুর বাড়ি পরীক্ষার পড়া করতে যাওয়া কিছু অপরাধ নয়। এর আগের পরীক্ষার বেলায় অমন সে কত রাত্রি বাইরে কাটিয়েছে। তার জন্যে অনুমতি নেবারও প্রয়োজন হয় নি। কেবল পুলিশের হাঙ্গামার ভয়েই না এই সতর্কতা!

তবু শৈলবিহারী প্রশ্ন করা মাত্র তিনি কেমন ভয় পেয়ে গেলেন।

বললেন, বিশুর কাছে গেছে পড়তে।

—রাত্রে পরের বাড়ি পড়তে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। আর কোনো দিন যেন না যায়।

—আচ্ছা।

—গিয়ে ডেকে আনব নাকি?

—ডেকে আবার আনবে কি? এই তো বিশুদের বাড়ি। সে একলা আসতে পারবে না?

সুরুচি ঝঙ্কার দিয়ে বললেন।

শান্তভাবে শৈলবিহারী বললেন, রাত হচ্ছে কি না, তাই বলছি।

একটু পরে আবার বললেন, সময়টা ভারী খারাপ। আজকালকার ছেলেদের আমি মোটে বিশ্বাস করি না। কী যে কখন করে!

বিরক্তভাবে সুরুচি বললেন, একটুখানি পড়তে গিয়েছে, তাতে অত ভয় পাচ্ছ কেন? এর আগের পরীক্ষাতেও শহরের মধ্যে কোন-না-কোন বন্ধুর কাছে পড়তে যেত!

—এর আগের পরীক্ষা!—শৈলবিহারী বললেন, সে এক দিন গিয়েছে। সেই টেকো লোকটিকে আজও মোড়ের মাথায় দেখলাম কি না!

এ সব কথায় ভয় সুরুচিরও হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, রামেন্দুকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তাঁর মনে অনুতাপও হচ্ছিল।

তবু জোরের সঙ্গে বললেন, টেকো লোকের জন্যে মানুষে কি তাহ'লে কাজকর্ম সব বন্ধ রাখবে?

পাশ ফিরে শুয়ে শৈলবিহারী বললেন, বন্ধ রাখার কথা নয়। কিন্তু সাবধানে থাকতে হবে।

—সমস্তক্ষণ লোকে কত সাবধানে থাকবে?

—না থাকলে বিপদে পড়বে।

একটু পরেই শৈলবিহারীর নাক ডাকতে লাগল। কিন্তু সুরুচির চোখে ঘুম আসে না।

এগারোটা বাজল—বারোটা—একটা—

সুরুচি অস্থির হয়ে উঠলেন।

যখন একটা-পাঁচ, তখন দরজায় শব্দ হ'ল খুট্।

সুরুচি উঠে দরজা খুলে দিলেন।

এত দেরি করে?

—দেরি কোথায় মা,—ঘড়ি দেখে রামেন্দু বললে,—ঠিক একটা পাঁচ। বাবা ঘুমিয়েছেন?

হ্যাঁ।

—আমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন না কি?

—না।

সুরুচি আবার মিথ্যা বললেন।

রামেন্দু খুশি হয়ে তার নিজের ঘরে শুতে চলে গেল।

[১৩]

পূজোর বন্ধের কিছুদিন পূর্বে খবর এল রামেন্দু গ্রেপ্তার হয়েছে। বাড়ি খানাতল্লাস ক'রে আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় নি। শৈলবিহারী কখনও চিঠি লেখেন না। কিন্তু এই ঘটনায় এমনি বিচলিত হয়েছেন যে স্বহস্তে হালদারসাহেবকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, পূজোর ছুটি হ'লেই তিনি সপরিবারে ক'লকাতায় চলে আসবেন।

হালদারসাহেবও এ সংবাদে কম বিচলিত হলেন না। কনক এবং লিলি নিঃশব্দেই এ সংবাদ গ্রহণ করলে। তারা বোধ হয় জানত, এমনি একটা কিছু ঘটবে এবং তার জন্যে প্রস্তুত হয়েও আছে।

হালদারসাহেব বিচলিত হয়ে বললেন, তাহ'লে তো একজন ভালো উকিল দিতে হয়।

—উকিল কি হবে ?

—তবে কি এখান থেকে একজন ভালো ব্যারিস্টার নিয়ে যাওয়া যাবে ?

ওরা দু'জনেই হেসে ফেলল, বললে, উকিল-ব্যারিস্টার কিছুতেই কুলোবে না দাদুভাই, ওকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনে ধরেছে।

—সেটা কি আইন ?

খুব চমৎকার আইন। বিচার হবে না, শাস্তি হবে না, শুধু অনির্দিষ্ট কালের জন্যে জেলের মধ্যে আটক থাকতে হবে।

—অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ?

—তাই। সে কা'ল ছাড়া পেয়ে যেতে পারে, আবার ইহজীবনেও ছাড়া না পেতে পারে।

তাহ'লে ?

হালদারসাহেব বিব্রতভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন।

কনক সান্ত্বনার সুরে বললে, আমাদের কিছুই করবার নেই, দাদু। আমরা শুধু নিঃশব্দে তার ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি। তার বেশি আর কিছু পারি না।

—কিন্তু সে যে কবে ফিরে আসবে তাও তো বলতে পারছিস না !

—না।

লিলি বললে, দুঃখ করছেন দাদু, কিন্তু আমরা তো জানি, সে একেবার নির্দোষ নয়। যারা গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করবে, প্রত্যুত্তরে গবর্ণমেণ্ট তাদের কিছুই করবে না, এ তো আর সত্যিই আমরা আশা করতে পারি না।

—তা পারি না।

—তবে ? যারা যাবে তারা শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হয়েই যাবে।

স্বাধীনতা চাইবে, অথচ তার মূল্য দেবে না, এ তো আর হ'তে পারে না।

হালদারসাহেব এইবার চোখ তুলে চাইলেন।

বললেন, তোদের কষ্ট হচ্ছে না?

—কষ্ট?—কনক একটা ঢোক গিললে,—কষ্ট হবে বই কি। কিন্তু দুঃখ করি না, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগও করব না।

কনক লিলির দিকে চাইলে।

লিলিও ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললে, আমরা নিঃশব্দে আমাদের প্রাপ্য মাথায় তুলে নোব দাদু। কারও বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ নেই।

অনেকক্ষণ পরে হালদারসাহেব বললেন, কিন্তু শৈল ভয়ানক কাতর হয়েছে মনে হয়।

কনক বললে, হবারই কথা। দাদার সম্বন্ধে তিনি যাই-হোক-একটা কল্পনা ক'রে রেখেছিলেন। দাদা পড়াশুনোয় ভালো। এম-এ'তে একটা ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তার পরে কোনো একটা কলেজে প্রোফেসারী নিয়ে বিয়ে-থা ক'রে হয়তো সকলের আনন্দবর্ধন করতে পারত। এমনি একটা মধুর কল্পনা ভেঙে গেলে সকল বাপ-মায়েরই দুঃখ হয়।

ওদের কথাবার্তা চলছে এমন সময় জ্ঞানেন্দ্র এল। জ্ঞানেন্দ্রর আসা-যাওয়া অতি নিঃশব্দে। এমন কি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল তাতে পর্যন্ত শব্দ হ'ল না।

ওদের চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্নভাবে জ্ঞানেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার?

কনক এবং লিলি সাড়া দিলে না।

হালদারসাহেব বললেন, কনকের দাদা গ্রেপ্তার হয়েছে।

—গ্রেপ্তার? কেন?

—জানা যাচ্ছে না অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার হয়েছে।

—ও !—জ্ঞানেন্দ্র অস্ফুটে একটা শব্দ করলে।

একটু পরে জ্ঞানেন্দ্র একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, এতক্ষণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল।

ওরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জ্ঞানেন্দ্রের দিকে চাইলে।

জ্ঞানেন্দ্র বলতে লাগল, ক'দিন আগে পুলিশ আমাকে অনেক প্রশ্ন ক'রে গেছে। কেন আমি এখানে আসি, আপনাদের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, কতদিনের আলাপ, এখানে কি আলোচনা হয়, এই সব নানারকমের প্রশ্ন। আমার এখানে আসার সঙ্গে পুলিশের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ভেবেই পাচ্ছিলাম না। এখন বুঝলাম, সন্দেহটা কোথায়।

জ্ঞানেন্দ্র হাসল।

কনক ব্যাকুলভাবে বললে, আপনি আর এখানে আসবেন না মিঃ মুখার্জি।

জ্ঞানেন্দ্র উপেক্ষাভরে হাসলে। বললে, কেন? পুলিশের ভয়ে?

—তাই যদি হয় সে কি উপেক্ষা করবার?

—আমি উপেক্ষাও করব না মিস হালদার, গ্রাহ্যও করব না। আমি জানি, আমি নিরপরাধ। যতক্ষণ সে ধারণা আমার থাকবে, ততক্ষণ পুলিশ চায় না ব'লেই আমি এখানে আসা বন্ধ করতে পারি না।

কনক এবারে কঠিন হ'ল। বললে, তাতে আপনি সান্ত্বনা পেতে পারেন, কিন্তু পুলিশের কর্তব্য শেষ হবে না। সত্যিই তো, আপনি এখানে প্রত্যহ কেন আসেন? আপনি আমাদের আত্মীয় নন, দীর্ঘকালের পরিচিতও নন। পুলিশ তো সন্দেহ করতেই পারে।

বিস্মিতভাবে জ্ঞানেন্দ্র বললে, তাই ব'লে আমি এখানে আসব না?

হালদারসাহেব এবং লিলি উভয়েই একসঙ্গে কনককে বাধা দিয়ে বললে, আঃ কনক!

কনক কিন্তু থামলে না।

কঠোরকণ্ঠে বললে, না, আসবেন না। কিসের জন্যে আসবেন? লিলি? সে আপনাদের বাড়িতে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসবে।

—শুধু লিলি?

—শুধু লিলি। সেই তো আপনাদের আত্মীয়া।

জ্ঞানেন্দ্র আর একটা কথাও বললে না। কিন্তু তার বেদনাহত মুখে এবং কুঞ্চিত ললাটে যে প্রশ্ন উদ্যত হয়ে উঠল তা এই যে, শুধু লিলি? শুধু লিলি? এখানে আর কেউ তার আত্মীয়া নেই?

কনকের এই আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক উত্তেজনায় হালদার-সাহেব এবং লিলি উভয়েই হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। বিহ্বলভাবে তাঁরা শুধু একবার কনকের এবং একবার জ্ঞানেন্দ্রর মুখের দিকে চাইতে লাগলেন।

মাটির দিকে চেয়ে জ্ঞানেন্দ্র নিঃশব্দে ব'সে ছিল। হঠাৎ যেন সে ঝাড়া দিয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে টুপিটা নিয়ে বললে, উত্তম মিস্ হালদার। এ জীবনে আপনাদের বাড়ির চৌকাট আর আমি পার হব না। নমস্কার মিঃ হালদার!

বিব্রতভাবে হালদারসাহেব বললেন, ও কি, তুমি উঠলে যে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

জ্ঞানেন্দ্র শুষ্কভাবে হাসলে। বললে:

—তুমি মাঝে মাঝে যেও লিলি। তুমি আমাদের আত্মীয়া। তোমার সঙ্গে তো অনেক দিনেরই পরিচয়। Good-bye!

প্রত্যুত্তরে লিলি একটা কথাও বলতে পারলে না।

কিন্তু কনক হঠাৎ এসে জ্ঞানেন্দ্রর পথরোধ ক'রে দাঁড়ালে। বললে, এক মিনিট মিঃ মুখার্জি। একটু চা খেয়ে যান। এসে পর্যন্ত অপমান ছাড়া আর আপনি কিছু পান নি।

—সেটা যে বুঝতে পেরেছেন এই আমার পক্ষে যথেষ্ট মিস্ হালদার। চায়ের আবশ্যক নেই। নমস্কার!

কনকের মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে হেসে জ্ঞানেন্দ্র চ'লে গেল। সেই আশ্চর্য এবং অস্বাভাবিক হাসির শব্দে কনকও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রথম বিহ্বলতার অভিভূত ভাবটা কেটে গেলে হালদারসাহেব বললেন, এটা কি হ'ল কনক?

—কোন্‌টা দাদুমণি?

—এই যে একজন ভদ্রসন্তানকে বাড়ি থেকে বার ক'রে দিলে, তাকে আর এ-বাড়ি আসতে নিষেধ করে দিলে?

—বার ক'রে তো দিইনি দাদুভাই। অন্য যেটা ক'রেছি তাতে ভদ্রসন্তানের উপকারই হবে।

—উপকারটা কি অন্যভাবে করা যেত না?

—বোধ হয় না, দাদুভাই।

এতক্ষণ পরে কনকের মুখে হাসি ফুটল। এবং হাসির সেই ক্ষীণ রেখা গোপন করবার জন্যে তাড়াতাড়ি টেবল-ক্লথটার দিকে মনোনিবেশ করলে।

ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হালদারসাহেব

বললেন, এটা যদি তোমাদের বিংশ শতাব্দীর একটা নমুনা হয় মিস্ হালদার, তাহ'লে আমি বিংশ শতাব্দীর জন্যে দুঃখিত।

উদ্যত ক্রোধ দমন করবার জন্যে হালদারসাহেব বাইরে উঠে গেলেন।

ব্যাপারটাকে হালকা করবার জন্যে কনক হাসতে হাসতে লিলিকে বললে, বিংশ শতাব্দীকে অভিশাপ দিতে দিতে তুই বেরিয়ে গেলি না? ও, যাচ্ছিস? তাই তো ভাবছিলাম।

কনক যেন হেসে ফেটে পড়ল।

লিলি কিন্তু একটা কথাও বললে না, ওর দিকে একবার চাইলেও না। নিঃশব্দে বাইরে গিয়ে পূর্বদিকের ঢাকা বারান্দায় যেখানে হালদারসাহেব চিন্তিতমুখে বসে ছিলেন, সেইখানে গিয়ে বসল।

ধীরে ধীরে কনকের মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। তার চোখ জ্বালা করতে লাগল। অবরুদ্ধ রোদনের বেগে ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সে দ্রুতবেগে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা ক'রে লিলি হালদারসাহেবের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকলে, দাদুমণি!

হালদারসাহেব নিঃশব্দে তাঁর বড় বড় ঘোলাটে চোখ মেলে চাইলেন।

—চলুন, আমরা আজ বিকেলে জ্ঞানদা'র ওখানে যাই।

—কি হবে গিয়ে?

—ওঁকে ধ'রে নিয়ে আসব।

হালদারসাহেব হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, সে কিছুতেই আসবে না।

—যদি কনককে শুদ্ধ নিয়ে যাই?

—সে যাবে না।

লিলি চুপ ক'রে ভাবতে লাগল। বস্তুতঃ স্বভাবতঃ নম্র এবং হাস্যপরায়ণা কনক কেনই বা জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গে এই রূঢ় ব্যবহার করলে এবং অত শান্তস্বভাব জ্ঞানেন্দ্রই বা কেন কনকের কথা অমন কঠোর ভাবে গ্রহণ করলে, তার কারণ ওঁরা খুঁজে পেলেন না।

কখনও মনে হয়, জ্ঞানেন্দ্রকে পুলিশের দৃষ্টি এবং তার অনিবার্য ফল থেকে বাঁচাবার জন্যেই তার এই রূঢ়তা। কিন্তু সেও তো তাকে অন্য সময়ে বুঝিয়ে বললেই পারত। কখনও মনে হয়, তাদের সম্বন্ধে পুলিশ যে সকল প্রশ্ন করছে, তার মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতই তাকে অত উত্তেজিত করেছে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রের এখানে আসা-যাওয়া যদি সত্যিই অশোভন না হয়, তাহ'লে প্রশ্নের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতই বা অশোভন হবে কেন? তবে কি রামেন্দুর গ্রেপ্তারেই কনকের মনের স্বাভাবিক সমতা নষ্ট হয়েছে? কিন্তু তার জন্যে এত লোক থাকতে অতিথির সঙ্গে অসৌজন্য করবে কেন?

হালদারসাহেব এবং লিলি এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছুই হ'ল না। কনকের ব্যবহারের নানারকম সদর্থ এবং কদর্থ করা সম্ভব।

হালদারসাহেব হেসে বললেন, একটা কথা তোদের আমি ক'দিন থেকেই বলব ভাবি, কিন্তু বলতে মনে থাকে না। জ্ঞানেন্দ্র এখানে আসছে, কনকের সঙ্গে মাখামাখিও ক্রমেই বাড়ছে, তবু আমি ভয় পাইনি।

লিলি নিরুত্তরে শুনে যেতে লাগল।

—ওদের বিবাহের পথে যে কত বাধা, সে তুই তো জানিসই। কিন্তু ভয় সেজন্যে নয়। যে দুঃখ এবং যে ব্যর্থতা আমার নিজের জীবনে পেয়েছি তার পরিচয় আমি জানি। সেই ব্যর্থতার অভিশাপ থেকে তোদের বাঁচাবার শক্তি আমি রাখি। সে ভয় করিনি। কিন্তু আমার কেমন

একটা সন্দেহ আছে, প্রথম যৌবনে মানুষের মনে প্রেমের কামনা জাগে, কিন্তু প্রেম জাগে না। হৃদয় নিয়ে ক'দিন ধ'রে তারা ছেলেখেলা করে। সে খেলা প্রেম নয়, প্রেমের অভিনয়।

—সে কি রকম?

—বড় প্রেমের জন্ম হয় বড় বেদনা থেকে। সে প্রেম চপল হৃদয়ের তাপে ফোটানো বাষ্প নয়, তা অশ্রুর মতো, শিশিরের মতো টুলটুলে।

লিলি খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। বললে, ব'লে যান, আমি প্রতিবাদ করব না। আমি টুলটুলে প্রেমও দেখিনি, বাষ্পীয় প্রেমও দেখিনি। প্রেমের যে এত রকম-ফের আছে, তাও জানতাম না।

হালদারসাহেব কিন্তু সে রসিকতায় যোগ দিলেন না। শান্ত, সমাহিত কণ্ঠে বললেন, সবই জানবে দিদি। সেই প্রার্থনাই করি। জীবনে যারা ভালোবাসার দুঃখ পেলে না, তাদের দুঃখের শেষ নেই।

—আপনি জেনেছেন?

—না জানলে এত কথা বলছি কি ক'রে দিদি? সিঁড়ির পথে যেতে-আসতে চুপি চুপি দুটো কথা, এঘর থেকে ওঘর যেতে হাতে গুঁজে দেওয়া চিঠি, প্রণয়ীর মুখের উপর আঁচলের ঝাপটা দিয়ে চ'লে যাওয়া কত কি তো দেখলাম।

—মিথ্যে কথা দাদুভাই, কক্ষণো দেখেন নি।

—না দেখলে বলছি কি ক'রে?

—বানিয়ে বলছেন। নয়তো কনকের দেখেছেন। আমার····

আমি····হালদারসাহেব চোখ পিটপিট ক'রে বললেন, দু'জনেরই দেখেছি বন্ধু। সত্যি কথা কি বানিয়ে বলা যায়?

লিলি ভ্রুকুটি ক'রে বললে, যান। দেখেছেন তো বেশ করেছেন! যত বাজে কথা!

হালদারসাহেব বলতে লাগলেন, তোদের কাণ্ড দেখেছি আর মনে-মনে কৌতুক বোধ করেছি। সেই সঙ্গে এও বুঝেছি, এ প্রেম নয়, প্রেমের বাষ্প। উবে যেতে দেরী হবে না।

লিলি ক্রুদ্ধভাবে বললে, আপনি তো সবই জেনেছেন !

হালদারসাহেব হাসলেন। বললেন, দেরী হ'লও না। জ্ঞানেন্দ্র এলেন, বিশ্বমোহন গেলেন। রামেন্দুর বরাত ভালো। তার প্রেমে এখনও প্রতিদ্বন্দ্বী জোটেনি। তবে জুটতে কতক্ষণ? কি বলিস?

—কিছু বলা যায় না। আপনি নিজেই তো আছেন।

—এই দেখ, আমি নিজেই তো আছি!

ওঁরা দু'জনেই হাসতে লাগলেন।

হালদারসাহেব বললেন, তাহ'লে সত্যি কথা বলি শোন্। তোকে যে আমি এত ভালোবাসি সে শুধু রামেন্দুকে ভালোবাসিস ব'লেই নয়।

— তবে?

—মাঝে মাঝে তোর হাসিতে, কথায়, বেণী দুলিয়ে চলবার ভঙ্গিতে আমার পুরাণো স্মৃতি জেগে ওঠে।

সর্বনাশ ক'রেছেন! তারপরে কি হয়?

—কিছুই হয় না। শুধু মনে একটু দোলা লাগে।

লিলি টিপে টিপে হাসতে লাগল।

তারপর বললে, আচ্ছা এমনও তো হ'তে পারে, আপনার নেপালের সেই প্রিয়ার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ কোনো সম্বন্ধ আছে?

—কি রকম?

আমার ঠাকুমার ছবি আপনি দেখেছেন। কে জানে তিনিই সেই কি না?

হালদারসাহেব হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন। বললেন, সেও কি সম্ভব?

—অসম্ভব কি? নামে মিলছে, চেহারায় মিলছে। তাছাড়া শুনেছি, নেপালে তাঁরও একজন আত্মীয় থাকতেন। ছেলেবেলায় সেখানে তিনি প্রায়ই থাকতেন।

হালদারসাহেব হঠাৎ যেন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেললেন। তিনি শুধু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

[১৪]

রামেন্দুর গ্রেপ্তার আর কারও কাছে অপ্রত্যাশিত না হলেও স্পষ্টই বোঝা গেল, শৈলবিহারী এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তার ধর্মঘটে যোগদান এবং কারাবাস তিনি শেষ পর্যন্ত সহজভাবেই নিয়েছিলেন। সে তো কলেজের অনেক ছেলেই ক'রেছিল। শেষ পর্যন্ত ও ঘটনাকে তিনি সাময়িক উচ্ছ্বাস বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি পুলিশ মাঝে মাঝে তাঁকে রামেন্দুর সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে গেলেও তিনি বিশেষ সচেতন হবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ভেবেছিলেন, এও পুলিশের অতি-সতর্কতা।

তারপরে একদিন হঠাৎ পুলিশ এল মাথায় লাল পাগড়ী বেঁধে সমস্ত বাড়ি ঘেরাও ক'রে।

তখনও ভোর হয়নি। চারিদিকে বেশ অন্ধকার আছে।

শৈলবিহারী এই সময়েই শয্যাত্যাগ করেন। প্রাতঃকৃত্য সেরে, স্নান সেরে তিনি যখন পূজায় বসেন, তখনও আকাশ যথেষ্ট ফর্সা হয় না।

সেদিনও তিনি তেমনি সময়েই শয্যাত্যাগ ক'রে গুণ গুণ ক'রে মন্ত্রপাঠ করতে করতে বাইরে এলেন। প্রথমটা তিনি কিছু খেয়াল করেন নি। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল বাইরে কারা যেন ফিসফাস করছে। কাদের যেন অত্যন্ত অস্পষ্ট সতর্ক পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পোষাকের খস্ খস্ শব্দ।

শৈলবিহারীর সর্বাঙ্গ ছম্ ছম্ ক'রে উঠল।

কে ওরা? কি চায়? এত রাত্রে অতগুলি লোক তাঁর বাড়ির চারিদিকে কি করছে?

কিন্তু বেশিক্ষণ তাঁকে ভাবতে হ'ল না। ওরা বোধ হয় দ্বার খোলার শব্দে তাঁর আগমন টের পেয়ে গিয়েছিল। উনি উঠানে নামতেই অনেকগুলি লোক একসঙ্গে কেউ খিড়কির দরজার কড়া নাড়তে, কেউ বা ধাক্কা দিতে লাগল।

শৈলবিহারীর বুকের ভিতরটা ধ্বক ক'রে উঠল।

স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কে?

—দরজাটা খুলুন তো।

—কে তোমরা?

—দরজা খুলন না, বলছি।

—খিড়কির দরজায় ধাক্কা দিচ্ছ কেন? সদরের দিকে যাও।

এর পরে তিনি বিশুদ্ধ হিন্দিতে প্রচণ্ড একটা ধমক খেলেন। তাদের কণ্ঠস্বরে এবং ভাষায় শৈলবিহারী ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে খিড়কির দরজাই খুলে দিলেন।

তার পরে—

যেমন বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে উন্মত্ত জলস্রোত প্রবেশ করে, তেমনি প্রচণ্ড বেগে ঢুকলো পুলিশের স্রোত। ঢুকছেই, ঢুকছেই। পাঁচ, দশ,

পোনেরো, কুড়ি, তার যেন আর শেষ নেই। তাদের কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে রিভলবার, কারও টর্চ। চক্ষের পলকে তারা সমস্ত বাড়িটা দখল ক'রে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তাদের ধাক্কায় সরতে সরতে শৈলবিহারী তখন উঠানের এক প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সমস্ত শরীর যেন এক অজ্ঞাত আতঙ্কে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে।

তারপরে আরম্ভ হল খানাতল্লাসী।

সে এক বিপর্যয় কাণ্ড!

ভোর পাঁচটা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত সেই পর্ব চললো। বাক্স, সুটকেস, আলমারী, খাট-পালঙ্ক, মায় লেপ-তোষক-বালিশ পর্যন্ত বাদ গেল না। উঠানের উপর সমস্ত স্তূপাকার হ'ল। এমন কি বাগানের কয়েকটা সন্দেহজনক স্থান, যেখানে রামেন্দু তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে মাঝে মাঝে বসত, সে সমস্তও খোঁড়া হ'ল। রান্নাঘর পর্যন্ত খানাতল্লাসীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে না।

বেলা বারোটায় খানাতল্লাসী শেষ হ'ল।

পুলিশের একজন বড় অফিসার মুহ্যমান শৈলবিহারীর আড়ষ্ট কর মর্দন করে এই অপ্রীতিকর কাজের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু সে সব কথা তাঁর কানে প্রবেশ করল বলে মনে হ'ল না।

খান কয়েক চিঠি, একখানা ডায়েরী, কয়েক খানা বই এবং আরও কি কি জিনিস পুলিশ নিয়ে গেল। সেই সঙ্গে রামেন্দুকেও। তাকে নিয়ে যাবার সময় জনৈক বাঙালী পুলিশ শৈলবিহারীর কাছে এসে সবিনয়ে নমস্কার ক'রে বললে, রামেন্দুকেও একবার আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হচ্ছে। কিছু ভাববেন না, ওর একটা স্টেট্‌মেণ্ট নিয়ে ছেড়ে দিতে আমাদের ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগবে না।

শৈলবিহারী ফ্যালফ্যাল ক'রে তার দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর তখন ভাববার শক্তি আছে কি না সন্দেহ।

পুলিশের ভারী বুটের শব্দ মিলিয়ে যেতেই বাড়িটা যেন নৈঃশব্দের মধ্যে ডুবে গেল।

উঠানে বাক্স-সুটকেস, খাট-পালঙ্ক-টেবিল-চেয়ার-আলমারী, কাপড়-জামা-লেপ-তোষক-বালিশের স্তূপ জমেছে। সেই দিকে চেয়ে বারান্দার এক কোণে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সুরুচি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মাথার অবগুণ্ঠন যে কখন খসে গেছে, তা তিনি জানতেও পারেন নি। চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। তাতে জলও ছিল না, জ্বালাও ছিল না।

উঠানের স্তূপীকৃত জিনিসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হিন্দুস্থানী চাকরটা বললে, মাঈজি, ওগুলো ঘরে তুলি?

মানুষের কণ্ঠস্বরে তিনি যেন চমকে উঠলেন। তাঁর চেতনা ফিরে এল। প্রথমেই তাঁর মনে হ'ল স্বামীর কথা। ভৃত্যের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়েই তিনি বাইরে চলে এলেন।

সেখানে জাফরী-দিয়ে-ঘেরা অংশের অন্তরালে একটি চেয়ারে শৈল-বিহারী এক তাল মাংসের পুঁটুলির মতো জবুথবু হয়ে বসে ছিলেন। সুরুচির আগমন তিনি টের পেলেন কি না বোঝা গেল না। পেলেও তাঁর দিকে একবার ফিরে চাইবারও প্রয়োজন তিনি বোধ করলেন না।

সুরুচি আস্তে আস্তে তাঁর চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ালেন।

শৈলবিহারী তথাপি ফিরে চাইলেন না।

একটু পরে সুরুচি বললে, কেন ভাবছ? পুলিশ তো বলেই গেছে, রামেন্দু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবে।

শৈলবিহারী তথাপি সাড়া দিলেন না।

অকস্মাৎ সুরুচি চমকে উঠলেন।

বললেন, কে যেন খুব আস্তে আস্তে কাঁদছে মনে হচ্ছে না? বিশুকেও কি ধরে নিয়ে গেল?

এতক্ষণে শৈলবিহারীর সাড়া পাওয়া গেল।

বিরক্তভাবে তিনি বললেন, তা আমি কি ক'রে জানব?

সুরুচি কান পেতে কান্নার শব্দটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সত্যি, নিজের ছেলের কথাই শুধু ভেবেছেন। বিশুও যে ধরা পড়তে পারে সে কথা তাঁর খেয়ালই হয়নি। মনে হচ্ছে যেন কান্নাটা বিশুদের বাড়ি থেকেই আসছে।

তিনি চাকরকে পাঠালেন খবরটা জানতে।

ফিরে এসে সে বললে, বিশুবাবুকেও ধরে নিয়ে গেছে। ও বাড়িতেও এই সঙ্গেই খানাতল্লাসী হয়েছে, এবং জিনিসপত্রের অবস্থা এই রকমই।

সুরুচির ইচ্ছা ছিল একবার নিজে গিয়ে বিশুর মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে আসার। কিন্তু এখন যাওয়া অসম্ভব।

শৈলবিহারীর সকালে আর পূজাহ্নিক হ'ল না। সমস্ত সকাল তিনি কারও সঙ্গে একটা কথাও কইলেন না। নিঃশব্দে স্নান সেরে দু'টি খেয়ে নিয়ে কলেজ গেলেন। খবর সেখানে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। প্রবীণ অধ্যাপকেরা শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে এসে তাঁকে অনেক সান্ত্বনার কথা বললেন। তরুণ অধ্যাপকেরা হাসিমুখে এসে তাঁকে উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করলেন। ছেলের দল এসে ঢিপ ঢিপ ক'রে প্রণাম করলে।

শৈলবিহারী অসাড়ভাবে সমস্ত গ্রহণ করলেন, এবং নির্বিকার চিত্তে সমস্ত শুনলেন। কাকেও একটা কথাও তিনি বলতে পারলেন না।

শুধু অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইতে লাগলেন। সেদিন তিনি ক্লাসও নিতে পারলেন না।

অন্য অনুভূতি কিছু তাঁর ছিল না। শুধু গলাটা ক্ষণে ক্ষণে শুকিয়ে যাচ্ছিল, আর বুকের ভিতর থেকে কি যেন একটা ঠেলে ঠেলে উঠছিল।

কলেজে কিছুক্ষণ থেকে তিনি বাড়ি ফিরে গিয়ে নিঃশব্দে শুয়ে পড়লেন। মনে মনে বোধ করি অপেক্ষা করতে লাগলেন, রামেন্দু এখনই ফিরে আসবে। পুলিশ কি তাঁকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে গেছে? কি দরকার দেবার? তিনি তো তাদের কোনো অনিষ্টই করেন নি। আসবে বই কি সে, নিশ্চয় আসবে।

কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। অবশেষে রাত্রিও হ'ল। রামেন্দু আর এল না। শুধু সুরুচি ক'বারই নিঃশব্দে এসে নতমুখে তাঁর খাটের পাশে দাঁড়ালেন। হয়তো তাঁর কিছু বলবার ছিল। কিন্তু স্বামীর পাথরের মতো ভাবলেশহীন মুখ দেখে বলবার সাহস হয় না। তিনি যেমন নিঃশব্দে আসেন, তেমনি নিঃশব্দে আবার ফিরে যান।

দু' তিন দিন এমনি নিঃশব্দে কাটল।

শৈলবিহারী ধীরে ধীরে একটুখানি যেন সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে যেন সন্ধ্যাহ্নিক, স্নানাহার, অধ্যাপনাতেও মন দিতে লাগলেন। কেবল কথা বেশি বলেন না।

ইতিমধ্যে আবার একদিন পুলিশ এল। সেবারের মতো পুলিশ বাহিনী নয়, একজন মাত্র পুলিশ অফিসার—শিক্ষিত, ভদ্র এবং বিনয়ের অবতার। সেদিনও ইনি এসেছিলেন।

ভদ্রলোক এসে শৈলবিহারীকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং

রামেন্দুকে ছেড়ে দিতে অনিবার্য কারণে বিলম্ব হওয়ার জন্যে অনেক ক্রটি স্বীকার করলেন, দুঃখও জানালেন।

রামেন্দুর প্রসঙ্গে শৈলবিহারী যেন অনেকখানি সুস্থবোধ করলেন। এ ক'দিনের মধ্যে রামেন্দুর কথা তাঁকে একটিবারও কেউ বলে নি। তার কথা ওঠেই নি।

বললেন, তার সঙ্গে একবার দেখা হয় না, দারোগাবাবু?

দারোগাবাবু সোৎসাহে বললেন, কেন হবে না? এ আর শক্ত কথা কি? চান দেখা করতে?

—চাই দারোগাবাবু।

আগ্রহাতিশয্যে তিনি সকাতরে দারোগাবাবুর হাত দুটি জড়িয়ে ধরলেন।

—চলুন তাহলে?

বাইরে একটা ট্যাক্সি বোধ করি এই জন্যেই বা অপেক্ষা করছিল। হাতের কাছে যে জামাটা ছিল সেইটে গায়ে চড়িয়েই শৈলবিহারী দারোগা-বাবুর সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। সুরুচিকে একবার বলে যাবার সময় পেলেন না।

এদিকে তাঁর স্নানাহারের সময় হ'ল। সুরুচি অপেক্ষা ক'রে থাকেন, হয়তো কাছেই কোথাও তিনি গেছেন। হয়তো ডক্টর বড়ুয়ার বাড়ি, নয়তো সরকার সাহেবের বাড়ি।

অবশেষে যখন বেলা বাড়তে লাগল, তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। চাকরকে পাঠালেন দুটো বাড়িতেই খোঁজ করতে। চাকর ফিরে এসে জানালে, সেখানে তিনি নেই।

তবে কোথায় গেলেন? কিছু আগে তো এইখানেই বসেছিলেন, জাফরি-ঘেরা বারান্দায়!

চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল। কলেজে, ক্লাবে, এমন কি শহরের মধ্যেও যেখানে-যেখানে তিনি মাঝে-মাঝে গিয়ে থাকেন, সেখানেও অনুসন্ধানের ত্রুটি হ'ল না। জঙ্গলের দিকে, পাহাড়ের দিকে, বেলা তিনটে পর্যন্ত সর্বত্র তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রেও কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি কোথাও যাননি, কেউ তাঁকে কোথাও যেতেও দেখেনি। তাঁর বৈঠকখানা ঘর থেকে তিনি যেন এক নিমেষের মধ্যে কর্পূরের মতো উবে গেলেন!

সুরুচি পাগলের মতো ঘর থেকে বাইরে, বাইরে থেকে ঘরে ছুটাছুটি করতে লাগলেন।

অবশেষে চারটের সময় তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল।

সন্ধান পাওয়া গেল ঠিক নয়, তিনি নিজেই একটা ট্যাক্সি ক'রে এসে উপস্থিত হলেন। সুরুচি রাগ করবেন কি তাঁর চেহারা দেখেই হতবাক হলেন। মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ রক্তবর্ণ, সমস্ত শরীর টলছে। ঠাকুর-চাকরে মিলে তাঁকে ধরাধরি ক'রে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে। কোথায় গিয়েছিলেন, কেন গিয়েছিলেন, গেলেন তো ব'লে যাননি কেন, এ কেউ জিজ্ঞাসা করতেই সাহস করলে না। খাওয়াদাওয়া রইল, সবাই তাঁকে নিয়েই পড়ল।

ডাক্তারও ডাকা হ'ল। তিনি নাড়ী দেখলেন, বুক দেখলেন, পেট দেখলেন, জিভ দেখলেন, কিন্তু রোগ যে ঠিক কি, কিছুই স্থির করতে পারলেন না।

কী রোগ হ'তে পারে? জ্বর নেই, জ্বালা নেই,—শুধু মাথা ঝিম ঝিম করে, গলা শুকিয়ে উঠে, বুকের ভিতর থেকে কি যেন একটা কেবলই ঠেলে ঠেলে উঠতে থাকে,—আর দাঁড়ালেই শরীর টলে। এ কি রোগ?

হার্ট? দুশ্চিন্তা?

অবশেষে একটু একটু ক'রে জানা গেল, শৈলবিহারীকে পুলিশে থানায় নিয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমার সঙ্গে কাউকে পাঠিয়ে দিন, ওষুধ নিয়ে আসবে। তবে আসলে ওঁর দরকার পূর্ণ বিশ্রাম, আর শুশ্রূষা। সম্ভব হলে বাইরে কোথাও নিয়েও যেতে পারেন।

সেই যুক্তিই ভালো। এখানে একা সুরুচি কি ওঁর উপযুক্ত শুশ্রূষা করতে পারবেন? রামেন্দু পর্যন্ত নেই। তার চেয়ে কলকাতায় নিয়ে গেলে শুধু যে চিকিৎসারই সুবিধা হবে তা নয়। সেখানে কনক আছে, লিলি আছে, মাথার উপর হালদারসাহেবের মতো একজন লোক আছেন। সেখানে অনেক সুবিধা।

তবু একজন ডাক্তার এখানে দেখছেন। এ শহরে বিচক্ষণ, বহুদর্শী এবং সুচিকিৎসক ব'লে এঁর নামযশ আছে। সুরুচি কয়েকদিন অপেক্ষা করাই সঙ্গত বিবেচনা করলেন। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম সমস্ত ত্যাগ ক'রে তিনি নিজেকে স্বামীর সেবায় ঢেলে দিলেন।

কিন্তু তথাপি শৈলবিহারীর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হ'ল না।

দাঁড়াতে গেলেই তাঁর সমস্ত শরীর ঠক ঠক ক'রে কাঁপে। কোথাও খুট ক'রে একটু শব্দ হলেই আতঙ্কে চমকে উঠে ভীতিবিহ্বল চোখে চারিদিকে চাইতে থাকেন। ঘুম একেবারেই গেল! ঘুমের ঘোরেও ক্রমাগত ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে ওঠেন। দেখতে দেখতে তাঁর দেহ যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যেতে লাগল।

ভয় পেয়ে সুরুচি বললেন, তাহ'লে বরং ক'লকাতাই যাই ডাক্তার-বাবু এখানে তো বিশেষ উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললেন, তাই যান বরং। সেখানে

অনেক বড় বড় ডাক্তার আছেন। তাঁদের চিকিৎসায় হয়তো উপকার পেতে পারেন।

সেই দিনই সুরুচি হালদারসাহেবের নামে ক'লকাতায় একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিলেন।

[১৫]

শৈলবিহারীর টেলিগ্রাম এল, কাল সকালে তাঁরা পৌঁছুচ্ছেন। কনক নিজে মোটর নিয়ে গিয়ে তাঁদের নিয়ে এল।

হালদারসাহেবকে লিলি খবরের কাগজ পড়িয়ে শোনাচ্ছিল। মোটরের শব্দ পেয়ে খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। মোটরটা এসে পৌঁছুতেই সে তাড়াতাড়ি মোটরের কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। কনক তাড়াতাড়ি মোটর থেকে নেমে চুপি চুপি লিলিকে বললে, বাবাকে আস্তে আস্তে নামাতে হবে।

সত্যি! কি হয়েছে শৈলবিহারীর চেহারা! মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। চোখের দৃষ্টি বিহ্বল, আতঙ্কগ্রস্তের মতো ঘোলাটে। কোথাও যেন এক ফোঁটা রক্ত নেই!

অত্যন্ত সন্তর্পণে তাঁকে নামান হ'ল। অতি কষ্টে লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি বারান্দায় উঠলেন। হালদারসাহেবকে প্রণাম ক'রে পাশের একখানা চেয়ারে বসলেন।

—তোমার কি অসুখ করেছিল শৈল?—হালদারসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

—না

—তবে চেহারা এরকম হয়েছে কেন?

শৈলবিহারী সাড়া দিলেন না।

চাকর জিনিসপত্রগুলো উপরে নিয়ে যেতে লাগল। বেশি জিনিস নয়। একটা বিছানা, গোটা দুই সুটকেশ, জলের কুঁজো, গ্লাস, এমনি টুকিটাকি নিতান্ত অপরিহার্য কতকগুলো জিনিস।

সুরুচি ঈষৎ ঘোমটা টেনে হালদারসাহেবকে প্রণাম করলেন।

তাঁকে দেখে হালদারসাহেব যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেয়েছেন এমনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

—তুমি এসেছ ছোটমা! আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম, অথচ তোমারই কথা মনে পড়ছিল না।

শৈলবিহারীর ওই চেহারা, সকলের মুখে এই থমথমে ভাব, যেন তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

শৈলবিহারী কনককে বললেন, আমার জন্যে এই নীচেই একটা ঘরে ব্যবস্থা করবি। দোতালায় ওঠা-নামা করতে কষ্ট হবে।

তাঁহার কণ্ঠে বিরক্তির সুর।

সিগ্ধকণ্ঠে কনক বললে, ওঠা-নামা করার দরকার কি বাবা? ওপরেই সব রয়েছে। বিকেলে সুমুখের খোলা বারান্দায় আপনার বসবার জায়গা ক'রে দোব। নীচে নামবার দরকারই হবে না।

হালদারসাহেব সুরুচির একখানা হাত ধ'রে বললেন, চল মা, আমরা ওঘরে যাই।

ওঘরে গিয়ে হালদারসাহেব একখানা কুশনে যেন ভেঙ্গে পড়লেন। উৎকণ্ঠায় নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বললেন, শৈলর কি হয়েছে? ও অমন ভেঙ্গে গেল কেন?

—কি জানি বাবা। যেদিন আমাদের বাড়ি খানাতল্লাস হ'ল,

অনেক লাঠিধারী পুলিশ, রিভলবারওয়ালা সার্জেণ্ট, দারোগা, পুলিশের বড় সাহেব, অনেক লোকের ভারি বুটের শব্দ, এই সবে কেমন যেন উনি ভড়কে গেলেন। তার ক'দিন পরে সকালে ওঁকে থানায় নিয়ে গেল। বিকেলে ফিরে এলেন যেন কী রকম হয়ে। তারপর দেখতে দেখতে ওই রকম হয়ে গেলেন।

—Nervous breakdown!

—ওখানকার ডাক্তার বললে, ভয়ে এই রকম হয়েছে। কি হবে বাবা!

সুরুচি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কি হবে তা হালদারসাহেবও বলতে পারেন না। কী হবে? কী হতে পারে? বিংশ শতাব্দী নিয়ে এসেছে এই অভিশাপ। পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র উঠেছে মানুষের হাহাকার। যাদের আছে, আর যাদের নেই, সবাই সমান ত্রস্ত। সমৃদ্ধিতে পর্যন্ত সুখ নেই। অত্যন্ত পুরাণো হয়ে গেছে এই পৃথিবী। এর বিধি বিধান, সমাজ শৃঙ্খলার বাঁধন গেছে পঁচে। এর বদ্ধ হাওয়ায় আর নিশ্বাস নেওয়া যায় না। নতুন ক'রে একে ঢেলে সাজতে হবে। তা ছাড়া আর করবার কিছু নেই।

সুরুচি বললেন, সে তো অনেক বড় কথা বাবা।

—বড় কথাই তো ছোটমা। অনেক বড় কথা। সেই অনেক বড় কথাকে এত ছোট ক'রে দেখতে গিয়েই তো বিপদ ঘটিয়েছি। তোমার স্বামীর নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। ডাক্তারী শাস্ত্রে তার হয়তো একটা সারাবার ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা করাও হবে। কিন্তু তাতে রোগটার চিকিৎসাই হবে ছোটমা, মানুষটার নয়। কালকে ওকে আর থানায় ধ'রে নিয়ে যেতে হবে না, রাস্তার মোড়ে একটা লাল পাগড়ি দেখলেই হয়তো এমনি ভেঙ্গে পড়বে। তার কি করবে? ঢেলে সাজতে হবে ছোটমা, সব ঢেলে সাজতে হবে। বুঝলে?

সমস্ত পৃথিবীটা ঢেলে সাজার কথা সুরুচি বুঝতে পারেন না। তিনি তাঁর ছোট দুঃখটাকেই বোঝেন এবং এক্ষুণিকার ছোট দুঃখটাকে।

বললেন, আপনাদের পেয়ে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম বাবা। আপনাকে বলব কি, ওঁকে নিয়ে এমন হয়েছে যে, একদণ্ড সেই ছেলেটার কথা পর্যন্ত ভাববার সময় পাই না। সে যে কোথায় আছে, কেমন আছে, তাই বা কে জানে?

চাকর এসে বললে, আপনার স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে মা।

—দিদিমণিরা কোথায়?

—বাবুর কাছে।

হালদারসাহেব বললেন, তুমি ওঠ মা। একে ট্রেনের ধকল, তাতে সারা রাত্রি জাগরণ। স্নানটা সেরে নিয়ে একটু বিশ্রাম করগে। ভয় কি? এখানে যখন এসেছ, তখন সব চেয়ে ভালো চিকিৎসা যা আছে, তা হবে। ওঠ।

সুরুচি চোখ মুছতে মুছতে উঠে গেলেন।

শৈলবিহারীর চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হ'ল না। ক'লকাতার সব চেয়ে যাঁরা বড় বড় ডাক্তার তাঁরা দেখে গেলেন। ঔষধ, পথ্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনেক কিছু ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু খুব যে বিশেষ উপকার হ'ল তা মনে হ'ল না।

শরীরের কিছু উন্নতি হয়েছে। মধ্যে নড়াচড়া প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এখন একটু-আধটু উঠে-হেঁটে বেড়াচ্ছেন। সকালে-সন্ধ্যায় মোটরেও খানিকটা ঘুরে আসেন। কিন্তু কি যে হয়েছে, কথা বড় একটা কারও সঙ্গে বলেন না। কেউ কথা বলতে এলেও বিরক্ত হন। বেশির

ভাগ সময় তিনি একা-একাই থাকেন, একা-একাই ঘোরেন, নয়তো বা নির্জন গৃহকোণে বসে বই পড়েন। সব চেয়ে বড় পরিবর্তন, সন্ধ্যাহ্নিক জপ-তপ একেবারে বন্ধ করেই দিয়েছেন, একাগ্র চিন্তা করতে পারেন না।

ছুটি অবশ্য এখনও অনেক দিন আছে। কিন্তু ডাক্তার বলছে, অন্ততঃ আরও তিন মাস ওঁর সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু ওঁকে আরও তিন মাস ছুটি নিতে কেউ রাজি করাতে পারছে না। বলছেন, তাহলে চাকরী যাবে।

হালদারসাহেব তাঁর নিজের ব্যাঙ্কের হিসাব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, চাকরী গেলেও তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না।

—না, না, সে ঠিক নয়। এ বাজারে চাকরী····

কনক বলেছে, চাকরী যাবেই বা কেন? এমন ছুটি তো সবাই নেয়।

উঁহুঁ। বুঝিস না। যা চাকরীর বাজার····

এর বেশি কেউ কিছু বলতে গেলে বিরক্ত হন।

আরও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় আগে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু আচার-বিচার সম্বন্ধে যে গোঁড়ামি তাঁর ছিল, তার বাইরের প্রকাশ একেবারেই নেই। মেয়েরা মোটর চালাচ্ছে, হালদারসাহেবের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে খাচ্ছে এসব এখন যেন তিনি দেখেও দেখেন না। বোধ করি তাঁর ধারণা হ'য়েছে তিরস্কারের বাঁধ দিয়ে এই অনাচারের স্রোত রোধ করা যাবে না।

এমনি ভাবে এদের মধ্যে থেকেও তিনি এদের সংস্রবের বাইরে দূরেই থাকেন। বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে কেউ তাঁর কাছে আসে না। বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে তিনি কাউকে ডাকেনও না। যাওয়া আসার পথে যদি কখনও ওদের বসবার ঘরে যান, এক মিনিট দাঁড়িয়ে, কখনও

হয়তো বা একটা কথা বলে, কখনও বা কিছুই না বলেই যেমন নিঃশব্দে আসেন, তেমনি নিঃশব্দেই চলে যান। কিন্তু সেই এক মিনিটেই ঘরের হাওয়াটা যেন সঙ্গে সঙ্গে গুমোটে ভারি হয়ে ওঠে।

সুরুচি বেশির ভাগ সময় রান্নাঘরেই থাকেন। নতুন নতুন পাঁচ-রকম রান্না করা তাঁর একটা সখ। হালদারসাহেবকে উপলক্ষ ক'রে সেই সখটা এখানেও পল্লবিত হয়ে উঠেছে। ফলে, ঠাকুরটার বিপদ বহু পরিমাণে বেড়ে গেছে।

সেদিন সকালে হালদারসাহেব ওদের নিয়ে বসবার ঘরে কি একটা বিষয়ে তুমুল আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন। এমন সময় সুরুচির গলা শোনা গেল : এসে পর্যন্ত মেয়েটাকে বলছি একবার কালীঘাটে নিয়ে চল, মাকে দর্শন ক'রে আসি। তা ও ফষ্টি করবে, না আমাকে নিয়ে যাবে!

ওদের আলোচনা সেই কণ্ঠস্বরে স্তব্ধ হয়ে গেল।

হালদারসাহেব চুপি চুপি বললেন, ছোটমার মা কি কালীঘাটে থাকেন না কি? ভারি অন্যায়। সেখানে এক দিন নিয়ে যাওয়া খুবই উচিত ছিল তোর।

কনক খিল খিল ক'রে হেসে উঠল :

—আপনি কি সাহেবী পোষাক পরে সবই গুলে মেরে দিয়েছেন দাদু? মা কেন হবেন?

—তবে? মাকে দেখে আসার কথাই বললেন যেন।

—সে মা নয়।

—তবে?

—মা কালীর কথা বলছেন। সত্যি ভারি ভুল হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি হাতঘড়িটা দেখে বললে, এখন মোটে আটটা। এখন গেলেও তো হয়! ও মা, মা!

দু'তিন ডাকের পর সুরুচি বিরক্তভাবে সাড়া দিলেন, কি ?

—কালীঘাটে যাবে বলেছিলে, যাবে না ?

—তোর সময় হোক, তবে তো।

—ও মা, আমি তো কখন থেকে তৈরী। তুমি শিগগির কাপড় বদলে এস। আটটা বাজে।

কনক ছুটতে ছুটতে গাড়ী বার করতে যাবে এমন সময় একটি মলিন বসন পরিহিত একজন হিন্দুস্থানী এসে তার হাতে ছোট একটি কাগজের টুকরা দিলে।

—কি এ ?—কনক ভ্রুভঙ্গির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

বাঁ হাত দিয়ে ট্রাম রাস্তার মোড়টা দেখিয়ে লোকটা সবিনয়ে বললে, সাহেব দিলে।

কনকের তখন চিঠি পড়া হয়ে গেছে। দু'লাইনের চিঠি। তাতে লেখা আছে, মোড়ের মাথায় পানওয়ালা সম্ভবত ইনফরমার। নানা ধরণের লোক ক্রমাগত তার কাছে এসে ফিসফাস করছে। সাবধানে থাকবেন।

নীচে কারও নাম নেই। কিন্তু কনকের বুঝতে দেরী হ'ল না যে, এ জ্ঞানেন্দ্ররই লেখা।

কনক পুনরায় লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কে ?

—রিক্সাওয়ালা। গাছের ছায়ায় গাড়ী নামিয়ে বসেছিলাম। সাহেব এসে বললে, এইখানা ওই ৩৮ নম্বর বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আয়, তোকে আট আনা বকশিস দোব।

আধুলিটা তখনও সে ট্যাকস্থ করবার অবকাশ পায় নি। হাত খুলে খুশি হয়ে দেখালে।

—কাকে চিঠিটা দিতে বলেছিলেন ? আমাকে কি ক'রে চিনলে তুমি ?

—বললেন, ওই বাড়ির একটি মেয়েকে দিতে।

একটি মেয়েকে দিতে! বিশেষ ক'রে তাকেই লেখা নয়!

লোকটিকে বিদায় ক'রে কনক চিঠিখানা নিয়ে ফের বসবার ঘরে ফিরে এল। লিলির হাতে চিঠিখানা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, মিঃ মুখার্জির লেখা নয়?

—তারই।

চিঠিখানা পড়ে বললে, কি সর্বনাশ!

হালদারসাহেব উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

লিলি চিঠিখানা ওঁর হাতে দিলে।

চিঠিখানা পড়ে হালদারসাহেব বললেন, তাইতো! শেষে কি তোদেরও পিছনে····

বাধা দিয়ে কনক বললে, কিন্তু মিঃ মুখার্জি কি ক'রে টের পেলেন?

হালদারসাহেব চোখ টিপে বললেন, বোঝা যাচ্ছে তিনি এদিকে ঘোরাঘুরি করেন।

কনক সে রসিকতা একেবারেই উপলব্ধি করতে পারলে না। বিরক্তভাবে বললে, কিন্তু তিনি কি জানেন না, এর ফল কি হতে পারে?

—জানলেও সে কথা উপলব্ধি করবার মত মনের অবস্থা তাঁর নয়।

ওদিকে সুরুচি তৈরী হয়ে ঘন ঘন ডাকাডাকি করছেন। কনক আর অপেক্ষা করতে পারলে না। বলতে বলতে গেল, এ ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়!

সেদিন যখন লিলি বলেছিল, চলুন দাছু, গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রকে ধ'রে নিয়ে আসি, হালদারসাহেব রাজি হন নি। এখন আর তাঁর সন্দেহ নেই যে, এখানে আসবার জন্তে জ্ঞানেন্দ্র উন্মুখ হয়ে আছে। তাকে একবার ডাকতে দেরী। সে শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষা করছে।

বোধ করি এখান থেকে বিদায় নেওয়ার পরদিন থেকেই এমনি করে এপাড়ায় ঘুরছে। লিলি একদিন ওকে বড় রাস্তার মোড়ে দেখেছিল; কিন্তু ঠিক চিনতে পারে নি। এখন মনে হচ্ছে হয়তো সেই বটে।

হালদারসাহেব বললেন, আর দেরী করা নয় ভাই। এখনই গিয়ে ওকে নিয়ে আসি চল। আর কতদিন হ্যাংলার মতো আনাচে-কানাচে বেড়াবে?

লিলি নিস্পৃহভাবে বললে, কি দরকার দাছু! তার সঙ্গে আপনাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার সম্পর্কে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সে এই বাড়ির সংস্পর্শে এসেছিল। এখন যদি সে বিদায় নিয়েই গিয়ে থাকে, আবার মিছে কেন তাকে আপনাদের সঙ্গে জড়ানো।

—তুইও অভিমান করলি দিদি? কনকের মন কি তুইও বুঝিস নি?

—বুঝেছি বলেই আর ডাকতে চাই না দাছুভাই। এতে হয়তো ছুজনেরই ভালো হবে।

কথাটা ভাববার। দাছু চুপ ক'রে রইলেন।

লিলি বললে, কনক শক্ত হয়েছে। জ্ঞান'দাও হয়তো আরও কয়েক দিন ঘোরাঘুরি ক'রে শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। বাকি আমরা।

আমাদেরও বোধ হয় একটু শক্ত হওয়া উচিত।

হালদারসাহেব একটু হাসলেন।

বললেন, তোমার কথাটা খুব বিজ্ঞের মতো হ'ল দিদিভাই। কিন্তু আমি তোমাদের নিয়ে এখানে এসেছি কেন বলেছি তো।

কি বলেছেন?

—এই জ্ঞানের খোলস খুলে ফেলতে চাই।

—তা যেন ফেললেন। কিন্তু সমাজকে তো আপনি ধমকে উড়িয়ে দিতে পারবেন না।

—আমি কাউকেই ধমকে দিতে চাই না লিলি। সমাজকেও উড়িয়ে দিতে চাই না। আমি শুধু এই অভিশপ্ত শতাব্দীর মাঝখানে ছোট্ট একটুখানি স্বর্গ রচনা করার অবকাশ চাই। যেখানে ভগবানের নাম নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠবে না। শান্তির নাম করে যেখানে মানুষে মানুষে যুদ্ধ বাধবে না। স্বার্থবুদ্ধি এসে যেখানে কল্যাণের পথ রোধ করবে না। সমাজের কথা বলছ? সমাজ থাকবে, কিন্তু পাহাড়ের মতো অনন্তকাল ধ'রে একই জায়গায় থাকবে না। তাকে আরও প্রশস্ত, আরও উদার করতে হবে।

—কিন্তু আমরা যে খৃস্টান।

—সে শুধু ধর্মে। নইলে আর সব দিক দিয়ে তোমরা আমাদেরই। ধর্ম ছাড়া আর কী তোমরা ত্যাগ করেছ বল তো?

লিলি হেসে ফেললে। বললে, কিছুই না। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন দাদুভাই, আমরা ব্রাহ্মণ ছিলাম, খৃস্টান হয়েও ব্রাহ্মণ-খৃস্টান ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমাদের কেউ কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় নি।

হালদারসাহেব অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, বলিস কি? হিন্দুত্ব ছেড়েছিস, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব ছাড়তে পারিস নি?

—এখনও তো পারি নি।

—আশ্চর্য!

লিলি হেসে বললে, কিছুই আশ্চর্য নয় দাদুভাই। আমি এমন মুসলমান পরিবার জানি, যাঁরা প্রায় একশো বছর ধরে মুসলমান হলেও সযত্নে ব্রাহ্মণ রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা ক'রে আসছেন।

—সত্যি?

—সত্যি।

অথচ নৃ-তত্ত্বে নাকি প্রমাণ হয়ে গেছে, বাঙালী সঙ্কর জাতি। আর্য-রক্তের আভিজাত্য তাদের মধ্যে নাকি অত্যন্ত সামান্য।

—আপনার বিশ্বাস হয়?

—আগে হ'ত। এখন তোর কথায় ধাঁধা লাগছে।

—যে জাত ধর্ম ত্যাগ করার পরেও রক্তের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে এত সচেতন, তার দেহে এমন ক'রে বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণ কি ক'রে সম্ভব হতে পারে?

—অথচ এ বৈজ্ঞানিক সত্য।

—হ্যাঁ। তুমি-আমি অস্বীকার করলেও এসে-যায় না। তাঁরা মাথার খুলি মেপে নির্ভুলভাবে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন।

—খুলির মাপ কি এতই প্রমাণ্য? দেশভেদে, যুগভেদে মানুষের দেহের এত পরিবর্তন হয়েছে, শুধু খুলিরই পরিবর্তন সম্ভব নয়?

—খুব সম্ভব নয়। নইলে প্রমাণ অত অকাট্য হবে কি ক'রে? কিন্তু অব্যাপারের আলোচনা থাক। জ্ঞানেন্দ্র সম্বন্ধে কি করা যায় বল।

—আমি কি বলব?

—তুমি কিছু বলবে না, কনক কিছু বলবে না, আমি কিছু বলব না।

তাহ'লে কি ও ব্যাচারা অমনি আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? বাঃ, বেশ তো!

—কিন্তু কাকাবাবু, কাকীমা কি ওর এ বাড়িতে আসা তেমন পছন্দ করবেন?

এতক্ষণ হালদারসাহেবের মুখের উপর যেন একখানা পাৎলা মেঘের ছায়া নামল। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, কাকীমার কথা জানি না। কিন্তু কাকাবাবু পছন্দ করবেন না সুনিশ্চিত।

—তাহ'লে?

—তাহ'লে থাক। এমনিতেই শৈলর নার্ভের অবস্থা ভালো নয়। এই ব্যাপারে হয়তো আরও খারাপ হয়ে যাবে।

দু'জনেই চিন্তিতভাবে ব'সে রইলেন।

একটু পরে হালদারসাহেব বললেন, তবে একটা কাজ এখন করা যায়।

—কি কাজ?

—আমরা তো জ্ঞানেন্দ্রর বাড়ি যেতে পারি। তাকে দুটো সান্ত্বনার কথাও বলতে পারি।

—তা পারি। তাই চলুন বরং। কনককেও জানিয়ে কাজ নেই। আজ বিকেলে ও যখন কাকাবাবুকে নিয়ে মোটরে বার হবে, আমরা তখন জ্ঞান'দার ওখানে যাব। দূরে তো নয়, একটা ট্যাক্সি ক'রে গেলেই চলবে। তবে দেখা পেলে হয়।

—কেন?

—সে না তখন এই পাড়াতেই ঘোরাঘুরি করতে থাকে।

দু'জনেই হেসে উঠলেন।

হালদারসাহেব এবং লিলি যখন জ্ঞানেন্দ্রের বাড়ি গিয়ে পৌঁছুলেন, তখনও সন্ধ্যা হয় নি। কিন্তু ওদের অপ্রশস্ত গলিটার মুখে ঈষৎ অন্ধকার নেমে এসেছে। জ্ঞানেন্দ্র সেই অন্ধকারে কি একখানা বই হাতে ক'রে জানালার বাইরে চেয়েছিল।

হালদারসাহেব আর কখনও এ বাড়িতে না এলেও লিলি প্রথম আগন্তুক নয়। চাকরটা ওদের আগে আগে এসে ঘরের আলো জ্বেলে দিলে। সেই আলোতে চমকে মুখ ফেরাতেই ওদের দু'জনকে দেখে জ্ঞানেন্দ্র উল্লসিত হয়ে উঠল।

কি সৌভাগ্য! আসুন, আসুন।

ব'লেই জ্ঞানেন্দ্র তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে সর্বাগ্রে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিলে।

—ও কি! আলো নেবাচ্ছ কেন? হালদারসাহেব সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

জ্ঞানেন্দ্র খোলা জানালার বাইরে চোখের ইঙ্গিত ক'রে বললে, ওই ভদ্রমহোদয়টির জন্যে।

—কে ও?

—ঠিক জানি না। প্রায়ই ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু দুপুরে ঘুম থেকে উঠে পর্যন্ত দেখছি, ওই জায়গায় লোকটি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

আলো নিবিয়ে দিতে প্রথমটা লিলির ভয় হয়েছিল। এখন হাসতে হাসতে আলোটা জ্বেলে দিয়ে বললে, সেইজন্যে আলোটা নিবিয়ে দিলে? দূর বোকা! তাতে তো ওর সন্দেহ আরও বাড়বে। ও কি আমাদের আসা জানে না ভেবেছ? আমরা তো ওর পাশ দিয়েই এসেছি।

জ্ঞানেন্দ্র অপ্রস্তুত হয়ে বললে, তাই নাকি? তাহ'লে আলো জ্বেলে ভালোই ক'রেছ।

তারপরে তাড়াতাড়ি উঠে হালদারসাহেবের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে অপ্রস্তুতভাবে বললে, ওই লোকটার জন্যে মনের এমনই গোলমাল হয়েছে যে, কতদিন পরে দেখা, আপনার পায়ের ধুলোটা পর্যন্ত নিতে খেয়াল ছিল না। ওটায় ছারপোকা। আপনি এই চেয়ারটায় বসুন। তারপরে সংবাদ কি বলুন।

—বলছি। আগে তোমার মথুরার সংবাদ বল দেখি?

—মথুরার?—জ্ঞানেন্দ্র হাসলে,—মথুরাই বটে। দেখছেন তো দ্বারে দৌবারিক দাঁড়িয়ে?

—দেখছি। কিন্তু তুমি সুট ছেড়ে দিলে নাকি?

অপাঙ্গে নিজের পরিধেয় খদ্দরের দিকে চেয়ে লজ্জিতভাবে জ্ঞানেন্দ্র বললে, না, না, ছাড়ব কেন, ছাড়িনি। কয়েক জোড়া খদ্দর কিনে দেখছি পরতে কেমন লাগে।

—কেমন দেখছ?

লিলির পরনের খদ্দরের শাড়ির দিকে চেয়ে বললে, মন্দ কি? না লিলি?

লিলি হেসে বললে, ওঁকে বল। আমরা নিজের পয়সায় খদ্দর কিনেও ওঁকে পরাতে পারি নি।

জ্ঞানেন্দ্রও হেসে বললে, না। খদ্দর দেখে যেমন ভয় হয়, পরতে তেমন ভয়ের কিছু নেই।

হালদারসাহেবও হাসলেন।

বললেন, আর কিছু তো নয় ভাই। কেবলই কেমন যেন ভয় হয়, ছুটো হাতে ধ'রে না থাকলে কাপড়খানা কখন বুঝি খুলে প'ড়ে যাবে।

উত্তর শুনে তারা ছু'জনেই হেসে উঠল।

লিলি ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললে, আপনার যত অনাসৃষ্টি কথা!

হঠাৎ এক সময় জ্ঞানেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, আপনার মোটরটা স্টার্ট নিচ্ছে তো ?

—নেবে না কেন ?

—কাল নিচ্ছিল না কিনা, তাই জিগ্যেস করছি।

হালদারসাহেব বললেন, তাই নাকি ? জানি না তো।

তারপর দুষ্টুমি ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ক'রে জানলে ?

—আমি ? বাঃ ! আমি তো····

বিব্রত জ্ঞানেন্দ্র প্রশ্নের জবাব দিতে ঘেমে উঠল। আর তার দুরবস্থায় হালদারসাহেব এবং লিলি দু'জনেই হেসে উঠলেন।

অবশেষে হালদারসাহেব বললেন, ওইখানে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে, তবু একবার আমার বাড়িতে ঢুঁ দাও না। কেন ? সেই ঝগড়া করতেই আমরা দু'জন এসেছি।

আবার এক ঝলক রক্ত জ্ঞানেন্দ্রর মুখখানা চকিতে রাঙা ক'রে দিলে।

বললে, ঢু মানে ইয়ে····আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি ?

—নিশ্চয়।

আবার জ্ঞানেন্দ্র ঘেমে উঠল। জড়িতকণ্ঠে বললে, আমি বলছিলাম····ইয়ে····

—কি ?

—একটু চা খাবেন ?

—না। তোমার ইয়েটা শুনি।

—খৃস্টানের সঙ্গে কি হিন্দুর বিবাহ অসম্ভব ? হিন্দু সমাজ কি তা মেনে নেবে না ?

হালদারসাহেব গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবলেন। তাঁর প্রশস্ত ললাটে কুঞ্চিত রেখা পড়ল।

ধীরে ধীরে বললেন, সমাজের কথা তো ঠিক জানি না ভাই। জানোই তো, তার সঙ্গে আমার যোগ অত্যন্ত অল্প। তবে মনে হয় মেনে নেবে না।

—আমাদের মতো খৃস্টানের সঙ্গেও না?

—তোমাদের কথা আমরা শুনেছি। তোমরা ধর্ম দিয়েছ, কিন্তু জাত এখনও দাও নি। এখনও তোমরা অত্যন্ত যত্নে ব্রাহ্মণ রক্তের বিশুদ্ধি রক্ষা ক'রেই চলেছ। তবু আমার আশঙ্কা আছে, সমাজ কিছুতেই এ বিবাহ মেনে নেবে না।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য কিছু নয় ভাই।—হালদারসাহেব তাঁর সেই আশ্চর্য ধীরতার সঙ্গে বলতে আরম্ভ করলেন,—এমনিই হয়। কোন সমাজই অত্যন্ত সহজে এবং নিঃশব্দে কোনো কিছু মেনে নেয় না। তাকে মানিয়ে নিতে হয়।

—কি ক'রে?

—তাকে না মেনে, অথচ তাকে ত্যাগ না ক'রে আমাদের কালে বিলেত যাওয়া সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। তারপরে যখন দলে দলে লোক সেই নিষেধ অমান্য ক'রে বিলেত যেতে লাগল, অথচ সমাজও ছাড়ল না, তখন বাধ্য হয়ে সমাজকে তা ধীরে ধীরে মেনে নিতে হ'ল! তোমরা একে যতটা অচল ভাব, সত্যি সত্যি ততটা অচল নয়। বহু কাল পরে বাঙলা দেশে ফিরে এসে এইটে সর্ব প্রথম আমার চোখে পড়েছে। আমি দেখেছি, বাইরে থেকে আঘাত দিয়ে কেউ এর দরজা খোলা পায় নি। কিন্তু ভিতর থেকে যখনই

আঘাত পড়েছে, তখনই দরজা খুলেছে। কখনও দেরী হয়েছে, কখনও হয় নি।

হালদারসাহেব উঠলেন। লিলির দিকে চেয়ে বললেন, রাত হয়ে যাচ্ছে দিদি। গাড়ী নিয়ে বেরুই নি। ফিরে এসে ওরা আবার ভাববে।

জ্ঞানেন্দ্র ব্যস্ত হয়ে উঠল :

গাড়ী নিয়ে বেরোন নি? সে কি?

—কনক গাড়ী নিয়ে বাপের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে। অনেক দিন তোমাকে দেখি নি। ভাবলাম, দেখাটা ক'রে আসি।

—বেশ! চলুন, চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি। ভালো কথা লিলি! আজকে তোমার বাবার একখানা চিঠি পেলাম। অনেক দিন তোমার কলেজ বন্ধ হয়েছে, অথচ তুমি বাড়ি গেলে না বলে তিনি ব্যস্ত হয়েছেন।

কৈফিয়ৎ স্বরূপ লিলি কি একটা বলতে যাচ্ছিল। হালদারসাহেব হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে টেনে এনে বললেন, ও আর বাড়ি যাবে না ভাই। ওর বাবাকে লিখে দিও, 'ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কলঙ্ক সাগরে!'

জ্ঞানেন্দ্র হেসে ফেললে। বললে, কোথায় ডুবল?

—সেইটিই আর এক আশ্চর্য দাদা! সাগর-মহাসাগর পার হয়ে এসে কলঙ্কিনী ডুবল আমার এই গোষ্পদ জলে!

ভ্রূভঙ্গ ক'রে লিলি বললে, আহা!

জ্ঞানেন্দ্র গড় হয়ে হালদারসাহেবের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে, আপনি অদ্ভুত, আপনি আশ্চর্য দাদু! You are great!

দাদু সভয়ে এক পা পিছিয়ে এসে বললেন, বড় ঘন ঘন প্রণাম করছ যে ভায়া? ট্যাঁক মারবার মতলব আছে না কি?

—চেষ্টা তো করছি। দেখি কি হয়!

ব'লে শিষ দিতে দিতে লাফাতে-লাফাতে জ্ঞানেন্দ্র গাড়ী বের করতে গেল।

[১৭]

সেদিন জ্ঞানেন্দ্র গেট পর্যন্ত এসে হালদারসাহেব ও লিলিকে পৌঁছে দিয়েই গাড়ী নিয়ে চলে গিয়েছিল। বাড়ির ভিতরে আর আসে নি। দাদুর অনুরোধে হাত যোড় ক'রে জানিয়েছিল, আর একদিন আসবে। শরীরটা তার ভালো নেই।

তারপর সাতদিন চলে গেছে, জ্ঞানেন্দ্র আর আসে নি। শরীরটা তার কেমন আছে কে জানে। সেদিন সত্যই তাকে অত্যন্ত দুর্বল বোধ হচ্ছিল। হালদারসাহেব তার জন্যে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

উপরের ঘরে শৈলবিহারী সমস্ত বাড়িতে গুমোট ধরিয়ে মেঘের মতো অবস্থান করছেন। কনক দিবারাত্রি সেইখানে। তার সঙ্গে হালদার-সাহেব এবং লিলির, এক বাড়িতে থেকেও, কদাচিৎ দেখা হয়। তার মুখেও শৈলবিহারীর মেঘের ছায়া নেমেছে। হাসির আলো খেলে না। হালদারসাহেব আগে মাঝে মাঝে শৈলবিহারীর ঘরে যেতেন, গল্প-গুজব করে তাঁর মনে প্রসন্নতা আনবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কয়েকদিনের পরেই সে ভুশ্চেষ্টা তিনি ছেড়ে দিলেন। এক একটা লোক থাকে যাদের হাসবার আগ্রহই কম। তারা সকল সময় খিট খিট করে, খুঁৎ খুঁৎ করে, বিড় বিড় করে,—আর তাই করতেই ভালোবাসে। শৈলবিহারীর বর্তমান খিট খিটে স্বভাবের কিছুটা হয়তো রোগে, কিন্তু কিছুটা যে তাঁর প্রাক্তন অভ্যাসও সে বিষয়ে ভুল নেই।

হালদারসাহেব নিরানন্দ সইতে পারেন না। মানুষ সকল সময়েই আনন্দ করবে, এ অবশ্য তিনি প্রত্যাশা করেন না। দুর্ভাগ্যের দিন যাদের এসেছে তারা দুঃখ করবেই, তারা দুঃখ করুক। হালদারসাহেব নিজেকে তাদের থেকে দূরে রাখেন।

সুতরাং কনকের সঙ্গে এখন তাঁর দেখাই কম হয়। তাঁর একমাত্র সঙ্গী এখন লিলি। সুরুচি নানা কাজের মধ্যে একটুখানি ফাঁক পেলে কখনও কখনও এসে বসেন, কিন্তু সেও নিতান্ত অল্প সময়ের জন্যে। তাঁরও কথার অধিকাংশই শৈলবিহারীকে কেন্দ্র ক'রে : কি ক'রে তিনি সেরে উঠবেন ? কই তিনি সেরে উঠছেন না তো ? এখন অবশ্য একটু ক'রে তিনি হাঁটছেন, কিন্তু কাল থেকে দাঁতের গোড়ায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। বোধ হয় কষ্ট দেবে। আরও একবার হয়েছিল কি না। সুরুচি জানেন সে কী যন্ত্রণা। এমনিতেই রক্ষা নেই। শৈলবিহারী বাড়িশুদ্ধ লোককে অস্থির করে তুলেছেন। এর পরে যদি আবার দাঁতের ব্যথা আরম্ভ হয়, তাহ'লে যে কি হবে সেই ভাবনায় তিনি অস্থির হয়েছেন।

শুনে হালদারসাহেব আর এক প্রস্থ দমে গেলেন।

লিলিকে বললেন, এ কী গেরো বল দেখি ! চিরটা জীবন কাটালাম বাইরে, সমস্ত ঝামেলি থেকে দূরে। জীবনের প্রান্তে এলাম তোদের কাছে। তোদের দেখে লোভ হ'ল। ভাবলাম, শেষ ক'টা দিন তোদের নিয়ে একটু শান্তিতে কাটাবো। কিন্তু তাতেও বিঘ্ন দেখ !

লিলি হেসে বললে, বিঘ্ন আবার কি দাদু। সংসারে থাকতে গেলে এটুকু বিঘ্নকে ভয় করলে চলবে কেন ?

—ভয় নয়, ভালো লাগে না।

—ভালো তো লাগবেই না। আপনি বললেন, এ শতাব্দীর

অভিশাপ। এই শতাব্দীর মধ্যে থেকে সে অভিশাপ এড়িয়ে যাবেন কি করে?

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে হালদারসাহেব বললেন, সেই তো আমার সাধনা লিলি ভাই। এই শতাব্দীর মধ্যে থেকেই এর বিষ আমি নিঃশেষে দূর করব। এরই মধ্যে আমার নতুন রচনার সৌধ গ'ড়ে উঠবে। পারব না?

—পারবেন বই কি দাদু? আপনার মতো যাঁরা সত্যিকার বড়, তাঁরাই তো সব ক'রে এসেছেন।

হালদারসাহেব মাথা নাড়তে নাড়তে অস্ফুট স্বরে আপন মনে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, আমি পারব। আমি জানি আমি পারব। আমাকে পারতেই হবে যে।

তখন অপরাহ্ণ বেলা। এ পাড়ার পরিচ্ছন্ন, অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তার উপর ছায়া নেমে এসেছে। মৃদু-মন্দ হাওয়া দিচ্ছে। সেই হাওয়ায় পথের ধারের একটি ফুলে ভরা গাছ থেকে রয়ে রয়ে অজস্র ফুল ঝরে পড়ছে। রং-বেরং-এর শাড়ি প'রে মেয়েরা গুচ্ছে গুচ্ছে বেরিয়েছে বৈকালিক ভ্রমণে। তাদের ছোট ছোট হাসির তরঙ্গ থেকে থেকে ভেসে আসছে।

কনক শৈলবিহারীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। সুরুচিও কি মনে করে তাদের সঙ্গে গেছেন।

হালদারসাহেব বললেন, জ্ঞানের আর কোনো খবরই পাওয়া গেল না। সেই যে আর একদিন আসবে বলে সেদিন গেট থেকে চলে গেল, তারপরে আর সংবাদই নেই! শরীরটা সেদিন তার ভালো ছিল না বলেছিল। কে জানে অসুখে পড়ল কি না।

—অসুখেও পড়তে পারে।

চিন্তিত মুখে হালদারসাহেব বললেন, তাহ'লে তো একবার খবরটা নিতে হয়।

—যাবেন ?

—যাওয়া উচিত। বিকেলে ওরা রোজই গাড়ী নিয়ে বার হচ্ছে। কাল সকালে বরং একবার যাওয়া যাবে, কি বলিস ?

—বেশ।

—ওদের বাড়িতে কি ফোন আছে ?

—না।

—তাহ'লে কাল সকালেই যাওয়া যাবে। ছেলেটির জন্যে চিন্তা হচ্ছে। সময়টা ভালো নয়। খবরের কাগজে দেখছিলাম, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটা খুবই হচ্ছে। একবার খবর নেওয়া উচিত।

লিলি বললে, দাদু, কতদিন আপনার মুখে কবিতা শুনি নি মনে আছে ?

হালদারসাহেব হাসলেন।

বললেন, অনেক দিন, না ? জ্ঞান চ'লে যাবার পর থেকেই কবিতা কি জানি কেন আর আসছে না। ছেলেটির বেশ একটি কবিমন আছে। তার পরেও যেটুকু কবিতা মনের মধ্যে ছিল, শৈলবিহারীর উত্তাপে তাও বাষ্প হয়ে উবে গেল।

—কিন্তু আমরা তো ওঁর বিশেষ কাজে আসি না। আমরা তো দূরে দূরেই রয়েছি।

—ঠিক। কিন্তু ওর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, ওর কম্পমান দেহ সব সময় আমার চোখের ওপর ঘুরছে। সে আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না। ভয়ে ভয়ে ভাবি, আমার মনেও কি শেষে অভিশাপের ছায়া নেমে আসবে নাকি ?

লিলি নিঃশব্দে ওঁর কথা শুনে যেতে লাগল।

হালদারসাহেব আবার বললেন :

—শৈলবিহারী আমার সন্তান, আমার একমাত্র সন্তান। আমার অবস্থাটা তুমি ভাবতে পার? ওকে দেখলে আমার বুকের ভিতরটা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। শুনছি, ওরা নাকি পুরী যাচ্ছে। তুমি কিছু শুনেছ?

—একদিন যেন সেই কথাই হচ্ছিল।

—ভালই। ওরা না গেলে আমাকেই যেতে হবে। আমি এ দৃশ্য আর সইতে পারছি না।

লিলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হালদারসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, রামেন্দুর কোনো খবর আর পাওয়া গেল?

লিলি লজ্জায় মুখ নামালে।

হালদারসাহেব হেসে ফেললেন।

বললেন, ওটা কি হ'ল? ব্রীড়া?

লিলি হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ। কিন্তু ও কথা আমাকে জিগ্যেস করার অর্থ কি? চিঠি এলে কি আমার কাছে আসবে?

—ঠিক। রামেন্দু, বিশু, ওদের কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। আচ্ছা, সেই যে ওদের প্রোফেসারটি....কি নাম তার?....

—প্রোফেসার ঘোষ?

—হ্যাঁ। তার খবর কিছু জান?

—না। তবে মনে হয়, হয় তিনি abscond করেছেন, নয় জেলে আশ্রয় নিয়েছেন।

চিন্তিত ভাবে হালদারসাহেব বললেন, তাইতো!

তারপর বললেন, দেশকে ভালোবেসে এত দুঃখ মানুষ পায় কেন, এই কথাটা আমি প্রায়ই ভাবি। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়, absolute justice বলেও বুঝি কিছু নেই।

একটুক্ষণ চুপ্ ক'রে থেকে লিলি বললে, আগুনে হাত দিলে অত্যন্ত সাধু ব্যক্তিরও হাত পোড়ে। এমনও তো হ'তে পারে দাদু, দেশপ্রেমের ধর্মই পোড়ানো।

হালদারসাহেব ধীরে ধীরে বললেন, সোনা আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়। এরা কি তাই হচ্ছে?

লিলি জবাব দিলে, সোনা যারা তারা খাঁটিই হচ্ছে। কিন্তু এই অগ্নি পরীক্ষায় শুধু সোনাই তো জোটেনি দাদু, রাংও জুটেছে। তারা কি আর কোনো ম্যাজিকে রূপো হতে পারে?

—তারা কি তাহ'লে শুধু দুঃখই পাবে?

—তা ছাড়া আর কি?

হালদারসাহেব নিঃশব্দে দূরের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

তারপর বললেন, আমি জানি রামেন্দুকে তুমি ভালোবাস। তার জন্যে তোমার কষ্ট হয় না?

—এ প্রশ্নের জবাব তো একদিন দিয়েছি দাদু।

মাথা নেড়ে হালদারসাহেব বললেন, খুব সম্ভব দিয়েছ। যদিও আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু কথাটা কি জান, তুমি আর রামেন্দু, কনক আর জ্ঞান,—তোমাদের কথা যখন ভাবি, তখন মানুষের জন্যে বড় দুঃখ হয় লিলি।

লিলি হেসে বললে, সেই সঙ্গে নিজের নামটাও যোগ ক'রে দিন স্যার।

—আমার নামটা? ও হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো শেষ পর্যন্ত পেলাম।

—কই পেলেন ?

—এই তো।

ব'লে গভীর স্নেহে হালদারসাহেব লিলিকে হাত দিয়ে কাছে আকর্ষণ করলেন।

পরদিন সকালেই খবর পাওয়া গেল, জ্ঞানেন্দ্র গ্রেপ্তার হয়েছে। কি অপরাধে জানা যায়নি, তবে অর্ডিন্যান্সে।

খবরটা শুনে কনক শুধু বললে, বেশ। ঠিকই হয়েছে !

লিলি বললে, ঠিকই হয়েছে ? সে যে কোনো অপরাধ করেনি সে তো আমরা সবাই জানি।

—তোমরা জানলে তো হবে না। যাদের জানবার কথা তাদের জানা চাই।

—তারা এত খবর জানে, আর এইটে জানে না ?

—না।

তারপর একটু ঘুরে এসে কনক বললে, তিনি আমার উপর রাগ করেছেন। এ বাড়ির গেট পর্যন্ত এসেও যে ভিতরে আসেননি সেও আমারই জন্যে। কিন্তু এখন বোধ হয় বুঝেছেন, কেন তাঁর উপর আমি অত কঠোর হয়েছিলাম।

হালদারসাহেব বললেন, তাতেও তো শেষরক্ষা হল না দিদি।

অন্যমনস্কভাবে কনক বললে, কি জানি কোথায় শেষ, কেমন করেই বা তা রক্ষা হবে।

তারপর দাদুর দিকে চেয়ে বললে, আমার কেবলই ভয় হচ্ছে দাদু, এই অভিশপ্ত শতাব্দীর বুকে একটুখানি স্বর্গ রচনার যে কল্পনা নিয়ে এখানে এসেছেন, তা হয়তো কল্পনাই রয়ে যাবে।

—কেন ?

—ঠিক জানি না। কিন্তু কেমন মনে হয়, শতাব্দীর অভিশাপ আমাদের রক্তকে পর্যন্ত বিষাক্ত ক'রে তুলেছে। এর থেকে আমাদের বুঝি পরিত্রাণ নেই।

বিহ্বল কণ্ঠে হালদারসাহেব বললেন, সব মিছে হবে ? এই পৃথিবীর যে রূপ আমি কল্পনায় দেখেছি,—উন্নত, উদার মানুষ, বলিষ্ঠ সুন্দর শিশু, রূপময়ী নারী, সহৃদয় সমাজ, সমদর্শী রাষ্ট্র,—সেই হাস্যময়ীরূপে এই পৃথিবী কোনোদিন জাগবে না ?

বেদনায় তাঁর স্বর যেন ভেঙ্গে পড়ল।

লিলি তাড়াতাড়ি এসে ওঁর কম্পিত, লোল একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, কে বললে জাগবে না দাদু ? আপনার মতো যাঁরা সত্যিই বড়, যাঁদের নিষ্ঠা আছে কিন্তু সংস্কার নেই, যাঁরা অনেক দুঃখ পেয়েছেন, তাঁদের সাধনা কিছুতেই মিথ্যা হবে না। কত ঘর ভাঙ্গবে, কত প্রিয়জন হারিয়ে যাবে, কত অঘটন ঘটবে, সেই সাধনা সমস্ত ভাঙ্গা-গড়াকে উপেক্ষা করেও থাকবে। তার মৃত্যু নেই।

—মৃত্যু নেই ?

—মৃত্যু নেই। তাই তো নির্দোষ হয়েও জ্ঞান'দা নিঃশব্দে চলে গেল।

—সে কি সমস্ত জেনেই গেছে তাহ'লে ?

—জেনেই তো গেছে ! আপনাকে যে ভালোবাসতে পেরেছে তার কি জানতে কিছু বাকি আছে নাকি ?

—জেনেই গেছে ?

হালদারসাহেব নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তাঁর ঘাড় ঝুলে পড়ল।

অস্ফুট স্বরে বললেন, ঠিক জানিস ?

—ঠিক জানি দাদু। ও তো জানত, ওর বাইরে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। তবু নির্দোষ হয়েও যে কারও বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করলে না, নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা পর্যন্ত করলে না, সে তো শুধু এই বিশ্বাসের জোরে যে, নতুন পৃথিবীর জন্ম আসন্ন। তাই কারও সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত করলে না। শুধু বার বার করে আপনার পায়ের ধুলা নিলে।

মৃদুকণ্ঠে হালদারসাহেব বললেন, নির্দোষ হয়েও বেচারা অনেক কষ্টই পাবে।

—পাওয়া যে চাই দাদু ভাই। জেলের ভিতরে, জেলের বাইরে, রণক্ষেত্রে, গৃহকোণে সমস্ত জায়গায় মানুষ দুঃখ পাবে, তবে তো আপনাদের সাধনা সম্পূর্ণ হবে।

—তবে তো মানুষকে ভালোবাসবে। ঠিক বলেছিস। দুঃখ পাওয়ার প্রয়োজন আছে।

হালদারসাহেব ধীরে ধীরে মাথা তুললেন। তাঁর সমস্ত দুঃখ একটা অপরূপ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

বললেন, অত্যন্ত চুপি চুপি, আমার সেই স্বপ্নের পৃথিবী জন্ম নিচ্ছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জানিস ?

ওরা অবাক হয়ে ওঁর উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে রইল।

শৈলবিহারীর ক'লকাতা আর ভালো লাগছে না। জনকোলাহল বিষ মনে হচ্ছে। কনক সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করে দিন রাত্রি তাঁর কাছে কাছে থেকে। তাঁকে খবরের কাগজ, বই পড়ে শোনায়, তাঁকে নিয়ে

বিকেলে গাড়ী করে বেড়াতে যায়। কিন্তু কিছুতেই তাঁর ভালো লাগছে না।

ডাক্তার দেখান শেষ হয়েছে। ঔষধপত্রের বাকি কিছু নেই। স্থির হয়েছে, কিছু দিনের জন্যে তিনি পুরী যাবেন। কনকেরও সঙ্গে যাওয়া স্থির হয়েছে। এবাড়িতে লিলিকে নিয়ে শুধু হালদারসাহেব থাকবেন।

রামেন্দুর চিঠি এসেছে। ভালো আছে। কিন্তু এ খবরটা যখন শৈলবিহারীকে শোনান হল, তিনি বিশেষ মন নিয়ে শুনলেন বলে মনে হল না। নিজের সম্বন্ধে ছাড়া আর কারও সম্বন্ধে চিন্তা করার তাঁর সময় নেই।

তিনি থেকে থেকে কেবল যাওয়ার তাগাদা দিচ্ছেন। নিজে উপস্থিত থেকে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করাচ্ছেন। কোন জিনিস আনা হয়েছে, কোনটা হয়নি, একবার করে তার ফর্দ করছেন, আর কাটছেন। এতদিন তাঁর গতিবিধি নিজের শোবার ঘর এবং তার সুমুখের বারান্দা-টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন কেনা-কাটি, জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা নিয়ে তাঁর ঘোরাঘুরি আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। মাঝে মাঝে প্রয়োজন হলে এর-ওর সঙ্গে কিছু কিছু কথাও কইছেন।

তাঁর সেবা তাঁর খিটখিটে স্বভাবের সান্নিধ্য থেকে সরে আসবার সুযোগ পেয়ে সুরুচিও অনেকখানি সুস্থ হয়েছেন। বেশির ভাগ সময় তিনি রান্নাঘরেই থাকেন। কেবল রামেন্দুর দুশ্চিন্তায় মনটা যখন তাঁর হু হু করে উঠে, তখনই হালদারসাহেব কাছে ছুটে আসেন। তাঁর ঘরে বসে, তাঁর কথাবার্তা শুনে তবু মনটা কিছু ভালো হয়।

হালদারসাহেবের এখন একমাত্র সঙ্গী লিলি। কখনও একখানা পড়ার বই নিয়ে, কখনও কিছু শেলায়ের কাজ নিয়ে, কখনও বা শুধু হাতেই সে সদাসর্বদা তাঁর কাছেই বসে থাকে। হালদারসাহেবের

আজকাল কথা কমে গেছে, কবিতা চর্চা একেবারেই বন্ধ। এখন তিনি শুধু রাজনীতির বই পড়েন। শৈলবিহারী যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় বিকেলের দিকে গাড়ীখানা প্রত্যহই পাওয়া যায়। লিলি ওঁকে নিয়ে বেড়াতে যায়।

বাড়ি থেকে ক্রমাগত তার আসার তাগিদ দিয়ে চিঠি আসছে। লিলি সে চিঠি পড়েই নিঃশব্দে রেখে দেয়। বাড়ি যাওয়ার জন্যে তার একেবারেই আগ্রহ নেই।

হালদারসাহেব মাঝে মাঝে পরিহাস করে বলেন, কি ব্যাপার বল তো লিলি? আমার প্রেমে পড়ে যাসনি তো?

লিলি হাসে।

বলে, বলা যায় কি!

—সারলে! তোর জন্যে শেষ পর্যন্ত কি পুনর্জন্মও বিশ্বাস করতে হবে নাকি?

—সে আর নতুন কথা কি? আপনারা তো তা বিশ্বাস করেই থাকেন।

—কক্ষণো না। এই সবে তোর পাল্লায় পড়ে একটু একটু করে বিশ্বাস হচ্ছে।

—তাহলেই হল।

হালদারসাহেব তাঁর ভারি হাতখানা শিথিলভাবে ওর কাঁধের উপর রাখলেন।

বললেন, Good, কিন্তু কনকের খবর কি?

—ভালো নয়।

—কেন?

—তাই মনে হয়। গল্প করে না, হাসে না, কথা পর্যন্ত বলে না।

সমস্তক্ষণ কাকাবাবুর কাছে কাছে রয়েছে। আপনার কি মনে হয় না, এর সমস্তটাই পিতৃভক্তি নয়, এর মধ্যে নিজেকে দুঃখ দেবার একটা মস্ত বড় চেষ্টা রয়েছে ?

—তুই সেটা ধরতে পেরেছিস ?

লিলি হাসলে।

বললে, এ ধরা আর এমন কী কঠিন !

হালদারসাহেব চুপ ক'রে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে বললেন, আমার বন্দুকটা বের করিস তো লিলি আজকে।

—বন্দুক কি হবে ?

—শিকার করতে ইচ্ছা করছে ভয়ানক। এখানে কাছাকাছি কোথাও শিকারের সুবিধা নেই ?

—কেন থাকবে না ? কালকেই আমি মার্কেট থেকে এক গাদা পাখী কিনে এনে ওইখানে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে রাখব। আপনি এইখানে ব'সে ব'সে শিকার করবেন ! আমি চা ক'রে আনব, ক্লান্ত হ'লে খাবেন।

লিলি হেসে উঠল।

দাদুও তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বললেন, উত্তম প্রস্তাব। বোঝা গেল শিকারের সম্বন্ধে তোমার কোনো আগ্রহ নেই। তাহ'লে এ অবস্থায় আর কি করা যেতে পারে বল। স্বর্গরচনা তো আপাততঃ স্থগিত রইল।

—স্থগিত থাকবে কেন ?

—তাইতো রয়েছে।

—না নেই। আপনি যেখানে থাকেন, যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণই প্রতি মুহূর্তে স্বর্গরচনা করে চলেন, আপনি নিজেও তা বুঝতে পারেন না।

হালদারসাহেব চুপ ক'রে রইলেন। বুড়ো মানুষ ঘুম ক'মে গেছে।

ভোর চারটের সময় উঠে বাইরের এই বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে একাই এতদিন ব'সে থাকতেন। ক'দিন থেকে লিলিও তা টের পেয়ে সেই সময়ে উঠে এসে বসতে আরম্ভ করেছে। সেই ভোরে এই বাড়ির কেউ তখন ওঠে না। লিলি ছোট একটি স্পিরিট ল্যাম্পে তাঁর জন্যে চা ক'রে দেয়, আর ব'সে ব'সে গল্প করে।

হালদারসাহেব বললেন, আচ্ছা তোর্ কি মনে হয় আমার পৃথিবীর যে রূপ আমি কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেছি, তা বাইরের এই চোখ দুটো দিয়ে দেখে যেতে পারব?

—সে তো কেউই কোনো দিন বাইরের চোখ দিয়ে দেখে যেতে পারবে না দাদুভাই!

—তবে? তবে কি ক'রে তা সম্ভব হবে?

—সত্যি বলেই সম্ভব হবে। কেউ তা কোনো দিন চোখে দেখবে না। তবু চিরদিন ধরে মানুষের কাছে তাই পৃথিবীর একমাত্র সত্যরূপ হয়ে থাকবে।

হালদারসাহেব আবার যেন ঝিমিয়ে পড়লেন।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে লিলি ওঁর সেই তদ্গত ভাবের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ এক সময় ভারি বুটের শব্দে পিছনে চেয়েই সে চমকে উঠল:

পুলিশ! বাড়ির বাইরে, বাড়ির ভিতরে সর্বত্রই লাল পাগড়ী গিস্‌গিস্ করছে।

লোকটা ভারি গলায় কি একটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন। ঠোঁটের উপর তর্জনী তুলে লিলি বললে, Sh! Don't shout. Come this way please.

পাশের ঘরে তাঁকে নিয়ে এসে বললে, এইবার বলুন আমরা আপনার কি করতে পারি?

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, উনি কি অসুস্থ ?

অসহিষ্ণুভাবে লিলি বললে, না। কিন্তু আপনার কি দরকার তাই বলুন।

—আপনার নাম কি ?

—লিলি সরকার।

—আপনাকে আমরা সম্রাটের নামে গ্রেপ্তার করলাম।

অফিসার তাকে ওয়ারেণ্ট দেখালেন।

ইতিমধ্যে আর একজন অফিসার কনককে নিয়ে এসে হাজির করলেন। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে হাসলে।

বাইরে থেকে হালদারসাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ কনক, লিলি !

—যাই দাদু।

ওরা যেতে উদ্যত হতেই পুলিশ বাধা দিলে।

নীচের তলায় খানাতল্লাস শেষ করে একদল পুলিশ দুম্ দুম্ শব্দে উপরে উঠে আসছে।

ওদের সাড়া না পেয়ে হালদারসাহেব এ ঘরে এসেই থমকে গেলেন। বললেন, ও !

তারপর বললেন, Good.

লিলি হেসে বললে, আপনাকে দুঃখ দিয়ে গেলাম দাদু। তাতে ক'রে অনেকদিন আমাদের মনে থাকবে।

দাদু মুখ নামিয়ে হাসলেন।

—স্বর্গ রচনা ভুলবেন না দাদু !

দাদু আর একবার হাসলেন। ঘোলাটে চোখ মেলে একবার বাইরের

দিকে চাইলেন। তখন সকাল হয়েছে। কিন্তু ঘোলাটে মেঘে আকাশ, সূর্য সবই আচ্ছন্ন।

পাৎলা পর্দার আড়ালে সুরুচির আবছা মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

ওরা যখন চলে যেতে উদ্যত তখন একটা অব্যক্ত আর্তনাদে পিছন ফিরে দেখলে শৈলবিহারী টলতে টলতে এসে দরজা ধ'রে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সর্বাঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপছে।

লিলি দুহাতে চোখ ঢাকলে।

অসহিষ্ণুভাবে কনক বললে, আর দেরী কেন? চলুন না কোথায় নিয়ে যাবেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ি খালি হয়ে গেল। শান্ত এবং নিস্তব্ধ। মাছরাঙা। পাখী পুকুর থেকে ছোঁ দিয়ে মাছ নিয়ে গেলে, পুকুরের জল যেমন একবার চঞ্চল হয়েই আবার স্থির হয়ে যায়, তেমনি।

—শেষ—